জননীসমুদ্র / অমর মিত্র

পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ফোন এসেছিল তার কলকাতার বাড়িতে। অনিমেষ তখন আলিপুরদুয়ার থেকে অনেকটা দূরে জয়ন্তী নদীর কোলে। বালিভাসা নদীর মধ্যে নিঃঝুম। বৈশাখের আকাশে মেঘ ছিল সেদিন, মাথার উপরে বিপুল সেই ধূসর আকাশ, ঘন নীলের ভিতর শাদা পুঞ্জ পুঞ্জ, ঠাকুরদা দাদামশায়ের পাকা দাড়ি। ওই ওপারে শিনচুলা পাহাড়, শূন্য চরাচর। নদীর ওপারে পাহাড়ের শুরু, ভুটান, ভিনদেশ। ওদিক থেকে পিপড়ের মতো মানুষ পার হয়ে আসছে নদী। তাও অনেকটা পশ্চিমে। সব দিক এক অপার্থিব নীরবতায় ডুবে ছিল। তার মোবাইল ফোনের টাওয়ার আসছে যাচ্ছে। এসেই মিলিয়ে যাচ্ছে। সে নিজে একবার চেষ্টা করেছিল কলকাতায় ফোন করতে, কিন্তু লাইন পায় নি। কিন্তু তাকে অবাক করে এগারটায় ফোন এল সুদীপ্তার, শুনেছ তুমি, দারুন খবর, তোমাকে তো সকাল থেকে পাচ্ছি না।

অনিমেষ বলল, তুমি লাইন পেলে কী করে, যা বলার তাড়াতাড়ি বলে ফেল, এখনই টাওয়ার থাকবে না।

কেন, তুমি কোথায় যে টাওয়ার থাকছে না?

আমি জয়ন্তী নদীর ভিতরে, ওপারে ভূটানের শিনচুল পাহাড়।

তুমি ফোন সুইচড অফ করে রেখেছিলে কেন?

না ফোন খোলাই ছিল, বলছি তো টাওয়ার থাকে না এখানে।

কত সময় ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছি, বলছে আইদার সুইচড অফ অর নট রিচেবল।

কী হয়েছে বল।

তুমি কবে ফিরবে ?

অনিমেষ বলল, সে তো তুমি জানই, ২২শে ট্রেনে চাপব, ২৩শে পৌঁছব, আবার পঁচিশে আমরা যাব বিষ্ণুপুর, বিষ্ণুপুর উৎসবে।

রাখো তোমার বিষ্ণুপুর উৎসব, শোনো ফোন এসেছিল পোর্ট ব্লেয়ার থেকে, মিঃ চন্দ অনেকবার তোমাকে ট্রাই করেছেন, কিন্তু তুমি তো নট রিচেবল হয়ে আছ...। সুদীপ্তার ফোন কেটে গেল। কথাটা না বলে আগডুম্বাগডুম বকে টাওয়ার ফুরিয়ে দিল। মিঃ চন্দ কেন ফোন করবেন ? অনিমেষ দেখল, টাওয়ার নেই, একেবারে খালি দেখাচ্ছে জায়গাটা, সব কটি দাগই অদৃশ্য। বিশ্বব্রহ্মান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রহিত। কোথায় পোর্ট ব্লেয়ার, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ আর কোথায় কলকাতা, আলিপুরদুয়ার, ভুটানের পাহাড়, জয়ন্তী নদী। সে এই শূন্য নদীতে একা হয়ে গেছে। মিঃ চন্দ তার কন্যার শ্বশুর মশায়। তার বৈবাহিক। বেয়াই

মশায়। তাঁরা দিন দশ আগে গেছেন পোর্ট ব্লেয়ার, বে-শোর অ্যাপার্টমেন্টের চার তলায় তাঁদের পুত্র-পুত্রবধুর কাছে। ঠিক আছে মারচের পর সে সপরিবারে যাবে। মেয়ে তিতলি বারবার ডাকছে, বাবা, এস, আমার সংসার দেখে যাও, আমার ঘর থেকে তুমি সমুদ্র দেখতে পাবে। সে একদিন ওয়েব ক্যামে নিজের ঘর দেখিয়েছে। নিজের সংসার। ওয়েব-ক্যামে দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল অনিমেষ। সেই মেয়েটা, সেই যে আর,জি,কর হাসপাতালে জন্মাল। মধ্যরাতে এসে নার্স দেখাল এক রত্তি শিশুকে। কোলাপসিবল গেট আটকানো ছিল। সে আর তার বন্ধু সুসীম বসেছিল বাইরে, সিঁড়িতে। মনে পড়ে মনে পড়ে। তখন হাসপাতালে মানুষের জন্ম হত। এখনো হয়। প্রতিদিন এত জন্ম, যাবে কোথায় প্রসূতি, কুঁড়ে ঘরের বাবুই, কাঠকুড়ুনি মা ? সে সরকারী কর্মী ছিল। সরকারী হাসপাতালে ফ্রি। তার কেবিন পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সুদীপ্তাকে রাখা হয়েছিল মেঝেতে। ঠাঁই নাই ঠাঁই ছোট এ তরী। পরপর কত প্রসূতি। সেই মেয়ে এখন বঙ্গোপসাগরের সেই দ্বীপান্তরের দ্বীপ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের এক দ্বীপে সংসার পাতিয়ে বসেছে। অথচ হাসপাতাল থেকে সুদীপ্তার আগেই তাকে তার হাতে দিয়ে দিয়েছিল। জন্ডিস হচ্ছিল সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুদের। মারা গিয়েছিল কয়েকটি শিশু। তাকে বাড়ি এনে মায়ের হাতে তুলে দিয়েছিল অনিমেষ।

অনিমেষ নদীর ভিতরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার সঙ্গে আলিপুরদুয়ার কলেজের অধ্যাপক শক্তিনাথ সেন। আর কলকাতা থেকে আসা দুই তরুণ কবি কমল ও সৌরভ। গাড়িটা শক্তিনাথের। সে অনিমেষের গুণগ্রাহী। আড্ডা দিচ্ছিল তরুণ কবি বন্ধুদের সঙ্গে। সে আর আড্ডায় মন বসাতে পারছিল না। কী বলেছেন মিঃ সুজন চন্দ ? মানুষটি বড় চাকরি করতেন। পুত্র আর পুত্রবধূ নিয়ে তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর ভুবন। অনিমেষের কন্যা এখন তাঁদের কন্যা হয়ে গেছে। তিনি কী এমন কথা বললেন যে তার জন্য সুদীপ্তাকে উত্তেজিত হয়ে ফোন করতে হবে। এখনো নিশ্চয় চেষ্টা করে যাচ্ছে সুদীপ্তা। অনিমেষ অমলের ফোনটি নিয়ে দেখল, ভোডাফোন কানেকশন—নেই। শক্তিনাথ বা অভিষেকের ফোনেও টাওয়ার নেই। তার মনে হচ্ছিল তখনই সেই স্থান ত্যাগ করে। সুদীপ্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায় সে। যত বয়স হচ্ছে, সে যেন অনেকটা পারিবারিক হয়ে পড়ছে। পরিবারের নানা ব্যাপারে জড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ অনিমেষ জানে, তার কিছু করার নেই। এই জগতের কোনো অবশ্যম্ভাবী ঘটনাকে সে প্রতিহত করতে পারবে না। তার জীবন মোটামুটি নিরুপদ্রব। মেয়ে ভালই সংসার গুছিয়ে বসেছে ওখানে। কোনো কোনো মেয়ে স্বামী সংসার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে থাকতে ভালবাসে। তার মেয়ে তিতলি তেমন। তিন বছর পূর্ণ হয়েছে বিয়ের। বছরে দুই বার মিঃ ও মিসেস চন্দ যান তাঁর পুত্র-পুত্রবধূর কাছে। এবারও তাঁরা গেছেন। তাঁদের যাওয়ার আগে তিতলি আর অভিরূপ গিয়েছিল বেইজিং। বেইজিং-এর অনেক ছবি পাঠিয়েছিল নেটে। কোন একশোতলা বিল্ডিঙের উপর থেকে তাকে চিঠি

লিখেছিল দুজন মিলে। সেই রঙিন পোস্টকার্ডটি অনিমেষ তার বুক শেলফের কাচের আড়ালে রেখে দিয়েছে। মেয়ে বেইজিং গিয়েছে। অনিমেষ এই জীবনে একবার বাংলাদেশ গিয়েছিল। যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে গিয়ে দেখেছিল কবি মধুসূদনের পৈতৃক ভিটে, কপোতাক্ষ নদ, খুলনা শহর, সাতক্ষীরা শহরের অনতিদূরে তাদের পিতৃপুরুষের গ্রাম। তারপর ঢাকা, রাজশাহী---এই পর্যন্ত। সে কোনোদিন বেইজিং, কুয়ালালামপুর কিংবা ব্যাঙ্কক যাওয়ার কথা ভাবেই নি। সমস্তজীবন কবিতা আর কবিতা। পত্রিকা বের করা, বই বের করা এই নিয়েই কেটেছে। তার সঙ্গে থেকে সুদীপ্তা ও তিতলি, তিতিরকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সঙ্গত করতে হয়েছে। কবিতাই তার দেশ দেখা। কবিতাই তার ভ্রমণ। সে শুধু বলে রেখেছে অনিকেতকে, যাবে, বোরবুদুর, আঙ্কোরভাট—যাবে। সেই যাওয়া স্থির হয়ে আছে। মার্চের পর। দেখে আসবে প্রাচীন ভারত। তার আরো গোপন ইচ্ছা আছে, জাভা সুমাত্রা বালিদ্বীপ ঘুরে আসে। কিন্তু হয়ে ওঠে কই ?

কী হল অনিমেষদা চুপ করে আছেন যে ? শক্তিনাথ জিজ্ঞেস করে।

বাড়ি থেকে ফোন এল, কী বলতে চাইল বোঝা গেল না।

বাড়িতে ফোন করবেন ?

কী করে করব, টাওয়ার নেই।

চলুন ল্যান্ড লাইন থেকে করবেন।

ল্যান্ড লাইন কোথায় ?

আসুন না। বলে দীর্ঘকায় শক্তিনাথ নদীর বালি ভেঙে তীরের দিকে এগোতে লাগল। সৌরভ আর কমল থাকল নদীর ভিতরে বসে। উদ্বিগ্ন অনিমেষ ভাবছিল কেন ফোন করলেন মিঃ চন্দ ? এমনি খোঁজ নেওয়ার হলে সেই কথা শোনাবার জন্য সুদীপ্তা এত হাঁকপাক করত না। সুদীপ্তা তিতির এখন নিজেদের ভিতরেই থাকে। তিতির তার দ্বিতীয়া কন্যা। বি, এ, পড়ে। এবার সেকেন্ড ইয়ার হবে। ওর জন্যই মার্চের পর যাওয়ার কথা ভেবেছে তারা।

নদীর দিকে পেছন ফিরে তাকায় অনিমেষ। দুই তরুণ কবি নদীর আরো ভিতরে চলে যাচ্ছে। ওদের বয়স অনেক কম। ওরা হয়ত নদীর ওপারের ওই শিনচুলা পাহাড় পার হয়ে যাবে। এদিকে কোথাও মোবাইল ফোনের টাওয়ার নেই। তার মানে ওরা তো ক্রমশ ক্রমশ হারিয়ে যাবে। অনিমেষ দাঁড়ায়, ওরা কোথায় যাচ্ছে ?

শক্তিনাথ হাসে, কোথায় আবার, নদীর ভিতর থেকে কোথায় যাবে ?

পাহাড়ের দিকে মনে হচ্ছে।

শক্তিনাথ বলল, পাহাড় অনেক দূর অনিমেষদা।

নদী পেরিয়েই না ?

শক্তিনাথ বলে, না না, অমনি মনে হয়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পালামৌ-এর মতোই।

সব পাহাড় আসলে দূরে ?

শক্তিনাথ বলল, জয়ন্তীর ধারেই বক্সা র্দুগ, পাহাড়ের অনেক উপরে, ওদের উপরে পাঠিয়ে দেব।

বক্সা কতদূর ?

এখান থেকে যাব, কাছেই, একটু ঘুরে যেতে হবে।

অনিমেষ এমনি। সে দেখছিল দুই তরুণ কবিকে। তারা ক্রমশ বিন্দুর মতো হয়ে যাচ্ছে। সৌরভ আর কমলের একজন তরুণ অধ্যাপক, অন্যজন ব্যাংকে আছে। ওরা মানিকজোড়। খুব বন্ধু দুজন। ওরা প্রেম করে দুই বোনের সঙ্গে। সেই দুই বোন আবার যমজ। ওরা নিজেদেরজনকে ভাল চেনে। দুজনে যেন মিলিয়ে গেল শূন্যে ভাসতে ভাসতে। নাকি এখনো আছে। আছে আছে, যেন ভ্রূণ হয়ে ভেসে আছে। ক'দিন ধরে মনের ভিতরে গুনগুন করছে একটি বিন্দুর মতো কবিতার চিহ্ন। ভ্রূণ হয়ে ভেসে আছি অন্ধকারে। সে আর দেখতে পাচ্ছে না ওদের। তাকে ডাকল শক্তিনাথ, আসুন দাদা।

নদী তীর থেকে একশো মিটার দূরে বড় একটি ধাবা। সেখানেই ল্যান্ড লাইন। ফোনে পেয়ে গেল অনিমেষ সুদীপ্তাকে। সুদীপ্তা বলল, মিঃ চন্দ অনেকবার চেষ্টা করেছেন তোমাকে, এই ঘন্টাখানেক আগে রির্পোটি নিয়ে এসেছে অভিরূপ।

কী হয়েছে ?

কী হয়েছে তুমি জান না ?

আমি কী করে জানব, আমাকে ফোনে পায় নি বলছ।

হ্যাঁ, তাইই তো, তুমি বরং ওই নদীর ভিতরে কবিতা পাঠ কর, তোমার জানতে হবে না।

একটা লাইন মাথার ভিতরে ঘুরছে ক'দিন ধরে, তিতির কোথায় ?

ওকে শোনাবে ! কবিতার লাইন ! আমি রেখে দিই, শোনো তুমি গ্রান্ড পা, দাদামশায় হতে যাচ্ছ, তা জান ?

তার মানে ! সব গুলিয়ে গেল অনিমেষ রায়ের। কী কী বলছ তুমি সুদীপ্তা? সত্যি? আমি গ্রান্ড পা। মানে দূর দক্ষিণে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ঘেরা সমুদ্রজলে সে এসেছে অন্ধকার মাতৃজলে। নুনের সাগরে। বঙ্গোপসাগরের জলে, পূব সমুদ্রের জলে, অপরান্ত সাগরের জলে, বিশ্বপিতার করুণায়। কী বলছ সুদীপ্তা ? ঠিক বলছি গো। আরো সংবাদ আছে। আরো আরো। আরো কী ? একজন নয় গো, দুজন। টুইন আসছে। এস দেখাব তাদের।

দেখাবে মানে কী দেখাবে এখন ?

তাদের দেখাব।

কী বলছ তুমি সুদীপ্তা, কাদের দেখাবে ?

মশায় সেই তাদের, ও মেইল পাঠিয়েছে, মেইলে সেই স্ক্যান রির্পোট আছে, তিতিরের মেইলেও দিয়েছে তুমি বাড়ি নেই শুনে।

তাতে কী আছে।

তারা আছে, নোটন ঝোটন। বলে হাসতে লাগল উল্লসিত সুদীপ্তা। কী আনন্দ তার। আনন্দ ছড়িয়ে পড়ছে দশ দিকে। জয়ন্তী নদীর হেথা হোথা। ওই যে বছর তিরিশের ভূটানি যুবতী নদী পার হয়ে এল, হাসছে যে। ঠিক খবর পেয়ে গেছে। আনন্দে স্নান করে গেল অনিমেষ। তার গা বেয়ে নেমে আসতে লাগল অদৃশ্য আনন্দজল।

ঠিক আছে সুদীপ্তা, আমি আলিপুরদুয়ার ফিরে দেখে নেব শক্তিনাথের বাড়ি গিয়ে নেট খুলে, আমি কাল চাপছি ট্রেনে, পরশু পৌঁছব।

সুদীপ্তা বলল, এস এস,এস, আনন্দ করব এস।

যাই, আমার কী রকম লাগছে সুদীপ্তা, পাগল পাগল লাগছে, সেই দিন জন্মাল ও, শবেবরাতের রাত ছিল, ওই দিন আল্লাহ নেমে এসে নাকি নবজাতকের কপালে ভাগ্য লিখে দেন, আমাদের বলেছিল জমিলা মাসি, সেই যে বুড়ি জমিলা, আমাদের বাড়িতে কাজ করতে আসত.........।

হুঁ হুঁ, সে বুড়ি বেঁচে আছে কি, নেই মনে হয়। বিড়বিড় করে বলল সুদীপ্তা।

খোঁজ করতে হবে। বলল অনিমেষ। বলতে বলতে আবার নদীর দিকে এগিয়ে গেল। উফ, এ নদীতে তেমন জল থাকলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ত জলে। সে যে ডালপালা মেলা একটি গাছ হয়ে যাচ্ছে এবার। ঝুরি নামানো বট।

২

আলিপুরদুয়ারে ই-মেইল দেখা হয় নি। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সংবরণ করেছিল অনিমেষ। স্ক্যান রির্পোট ফাইল অ্যাটাচ করে তাকে পাঠিয়েছে তিতলি। সে মা হতে যাচ্ছে। মাদার। তিতলি মেইলে লিখেছে, বাবা, তোমার গ্রান্ড চাইল্ডদের দ্যাখো, বাবা ও বাবা। ঘটনাটি সদ্য ঘটেছে। এই ঘটনা পাঁচ কান করবে কেন অনিমেষ ? সুদীপ্তা বারণ করেছে। সুদীপ্তা অনেক বাস্তববাদী। সে পরে ফোন করে বলেছে, কাউকে না বলতে। অনিমেষ যেন তার কবি বন্ধুদের হাটে না বলে বসে।

মেইল চেক করতে গেলে সকলের জেনে যাওয়ার একটি সম্ভাবনা থাকে। তা না করাই ভাল। কিন্তু অনিমেষ চৌধুরী কথাটা শোনার পর মনে মনে পাগলই হয়ে গিয়েছিল। সে নেমে গিয়েছিল আবার জয়ন্তীর ভিতরে।। বির্স্তীণ বালুকাচ্ছন্ন নদী, ওই ওপারে শিনচুলা পাহাড়শ্রেনী, শূন্য শূন্য শূন্য। মাথার উপরে আকাশটা কত বড়। বড় আর গম্ভীর। গম্ভীর আর শূন্য। শূন্য শূন্য, গম্ভীর গম্ভীর। কিন্তু এই মহাশূন্যতার ভিতরে পরম গম্ভীরতার ভিতর কোথায় যেন একটি বিন্দু, না না, দুইটি বিন্দুর চিহ্ন। দেখা যায় না, অনুভব করা যায়।

অনিমেষের মনে হচ্ছিল এই শূন্যতা রিক্ততা ভরে উঠতে যাচ্ছে। সে সদ্য অবসর নিয়েছে। এই তো একটি মাস। এখন তার আর কোনো কাজ নেই। তার কাছে অফার ছিল, সে না করে দিয়েছে। সমস্ত জীবন ধরে যা অর্জন করেছে এই পৃথিবী থেকে তা যেন ফিরিয়ে দেওয়ার সময় হয় অবসরের পর। অদ্ভূত মানুষ অনিমেষ। সে তো এও জানে মানুষের জীবনে অবসর বলে কিছু নেই। বেঁচে থাকাই তো মানুষের সবচেয়ে বড় কাজ। সে সারাজীবন ধরে সেই কাজই করেছে। এখনো সেই কাজই করে যাচ্ছে। বেঁচে থাকার আয়োজন করে যায় নিরন্তর।

অনিমেষ নদীর ভিতরে একা হয়ে গিয়ে শান্ত গলায় বলেছিল, তুমি কি জান ?

কী জানি ? পাহাড় নদী আকাশ থেকে কথা ভেসে এসেছিল অনিমেষের কাছে।

তুমিই তো দিয়েছ মনে হয়।

কী দিয়েছি ?

অনিমেষ চৌধুরীর মনে হয়েছিল, সে সেই শূন্যতাকে শুনিয়ে দেয়, সেই রিক্ততাকে শুনিয়ে দেয়, ভরে উঠেছে, ভরে দিয়েছ যে তা জান না।

কী জানব ?

অনিমেষ বলেছিল, আসলে তুমি এতই পরির্পূণ যে তুমি কতটুকু দিলে তা জান না।

কী জানি না। মহাপ্রকৃতি বলেছিল।

অনিমেষ বলেছিল, দিয়েছ অথচ জান না?

চুপ করেছিল সব কিছু। তার অনেক পরে অনিমেষ শুনেছিল অচেনা ক্লণ্ঠস্বর, তুমি বলো অনিমেষ, আমরা শুনি।

আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

আনন্দ করো।

আমাকেও ভরে দিয়েছ।

কী জানি !

অনিমেষের মনে হয়েছিল সে শুনিয়ে দেয় সেই জয়ন্তী নদী সেই শিনচুলা পাহাড় আর মাথার উপরের আকাশকে। আমার কন্যা একই সঙ্গে দুইটি সন্তানের মা হতে যাচ্ছে। সেই খবর এসেছে। তুমি তোমরা দিয়েছ। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার সমস্ত শূন্যতা ভরে উঠছে।

কলকাতায় ফিরে অনিমেষ দেখেছে ই-মেলে সংযুক্ত করা ফাইল, বাবা, তোমার গ্রান্ড চাইল্ডদের দ্যাখো। হ্যা, দেখল অনিমেষ। দুটি অঙ্কুর যেন এক এক টুকরো মেঘের পিন্ড। ধুসর রং তাদের। তারা পাশাপাশি। দুইটি আলাদা বৃত্তের মধ্যে। সুদীপ্তা বলল, একই বৃন্তে দুইটি ফুল।

লাল ফুল নীল ফুল। অনিমেষ বলল।

সুদীপ্তা বলল, হলুদ ফুল কলুদ ফুল।

সূর্যমুখী চন্দ্রমুখী।

সুদীপ্তা বলল, চম্পা চামেলি।

অনিমেষ বলল, অরুণ বরুণ।

হাসতে হাসতে সুদীপ্তা বলল, কিরণমালা হিরণমালা।

অনিমেষ বলল, শিমুল পলাশ।

কতদিন বাদে সুদীপ্তা গেয়ে উঠল, ও পলাশ ও শিমুল, আমার এ ঘুম কেন ভাঙালে........... যাক বেলা যাক না আঁখি দুটি থাক না সুন্দর স্বপনে মগ্ন...।

তখন তিতির এসে গেল, সে হল্লা জুড়ে দিল, গ্রেট গ্রেট, বাবা সেলিব্রেট করো, কি খাওয়াবে বল, উফ, গ্র্যান্ড, আমি কিন্তু কাউকে এখনো বলি নি।

না বলিস না। উঠে গেল সুদীপ্তা, বলার কী আছে?

বলার আছে মা, আনন্দের দিন আসছে, এসে গেছে, বলব না?

হুম, বলবি, ও যখন বলতে বলবে, তখন বলবি। অনিমেষ বলল।

তিতির বলল, ইস, আমি মেইল দেখছি আর ভাবছি, এই রকম থাকে এই রকম, আমিও ছিলাম,তুমিও ছিলে......রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দও ছিল, দিদিও ছিল। বলতে বলতে তিতির তার স্প্যানিশ গিটারে টুংটাং করতে লাগল।

তিতির গোপনে কবিতা লেখে। কিন্তু তার জগত আলাদা। আসলে জগতটা যে কী তা ভাল জানে না অনিমেষ। তিতির গিটার বাজায়। তিতির ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল শোনে। তার কাছে অনিমেষ পিঙ্ক ফ্লয়েড জেনেছে। এখন জানা আর শেখায় কত সুবিধে। ছোটবেলায় রেডিও ব্যতীত গানের কোনো সূত্রই ছিল না। খুব মনে হত তাদের বাড়িতে একটা গ্রামোফোন থাকুক। ছিল না। বাবার বন্ধু মহীন বসু একটি রের্কড করেছিলেন আধুনিক গানের। ৭৮ আর, পি, এম রের্কড, দু'পিঠে দুটি গান। সেই রের্কড নিয়ে হাজির মহীন বসু। তাদের শোনাবেন। উপহার দেবেন রের্কড। কিন্তু শুনবে কী করে তারা ? বাজাবে কী করে ? পাশের বাড়ি, তাদের ভাড়াটে বাড়ির ল্যান্ড লর্ডের বাড়ি, সেই বাড়িতে নিত্য গ্রামোফোন বাজে। সুখী গৃহকোণ। জানালায় বসে অনিমেষ আর তার দাদা শুনত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'পথ হারাব বলেই এবার পথে নেমেছি...।' আরো কত গান। সেই বাড়িতে গিয়েছিলেন বাবা আর মহীন বসু। রের্কড বেজেছিল। জানালায় বসে অনিমেষ, তার দাদা নিখিলেশ আর দিদি চন্দনা ও মা বিভা শুনেছিল মহীন বসুর গান, তুমি কী কথা না বলে চলিয়া গিয়াছ, নামিছে অন্ধকার।

সেই গানটি মনে আছে অনিমেষের। রের্কডটি নেই। ছিল, খুব যত্নে রেখেছিল বাবা। তারা ভাবত একদিন আসবে গ্রামোফোন। আবার বেজে উঠবে সেই গান......"তুমি কী কথা না বলে চলিয়া গিয়াছ, নামিছে অন্ধকার। " সাধু আর চলিত শব্দে মেশান সেই

গানের বাণী। কি সুন্দর ! গান লিখেছিলেন মহীন নিজেই। সুরটি ছিল মিশ্ররাগে। সুরকার কে ছিল তা জানে না অনিমেষ। রের্কড তোলা ছিল। তারপর কবে হারিয়ে যায় মনে নেই। অনেকদিন বাদে সেই রেকর্ডের কথা মনে পড়ল। সেই গান। কেন মনে পড়ল তা বলতে পারবে না অনিমেষ। তার সামনে মেইল খোলা। মেইল অ্যাটাচমেন্ট খোলা। দুই প্রাণের চিহ্ন পাশাপাশি যেন দুই ঘরে। দুই বাসায়।

"তুমি কী কথা বলিতে আসিয়াছ ওগো, নীরব রয়েছ কেন?"

মহীন বসুর গানের আর একটি পংক্তি মনের ভিতরে জেগে উঠল। গুনগুন করে উঠল অনিমেষ। তিতির জিজ্ঞেস করল, কী গাইছ বাবা ?

ইউ টিউব খুঁজিস তো।

কী খুঁজব ?

মহীন বসুর গান।

কে মহীন বসু?

আমাদের ছেলেবেলার গায়ক, আমার বাবার বন্ধু ছ্লিেন।

সে তো তুমিও পাবে র্সাচ করলে, আমাকে খুঁজতে হবে কেন?

অনিমেষ বলল, আমার মনে হয় তুই খুঁজলে পাবি, আমার কাছে ধরা দেবে না।

ওক্কে, আমি দেখব নেট র্সাচ করে, তুমি বস আমি আসছি। বলতে বলতে তিতির উঠে গেল। অনিমেষ চুপ করে সে জলভরা মেঘের মতো দুটি প্রাণের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘরে কেউ নেই। অনিমেষের মনে হয় দুই মেঘপুঞ্জ যেন স্পন্দিত হচ্ছে মনিটরের র্পদায়। চোখ প্রস্ফূটিত হচ্ছে দুই মেঘের। চোখের তারা টলমল করছে। সে চাপা গলায় ডাক দিল যেন, হাই !

হাই-ই ই ! অনেকটা সময় বাদে ফিসফিসে গলায় যেন উত্তর পায় অনি্মেষ। শিহরিত হয়, গায়ে কাঁটা দেয়। সে জিজ্ঞেস করে, কে তোমরা ?

আমি আমি, ও ও, তুমি কে ?

অনিমেষ।

ওকে, আমরা ঘুমোই, দোল দিচ্ছে।

কে দেয় দোল ?

তিতলি, তুমি তাকে চেন না, ঘুমোই, তুমি যাও।

কোথায় আছ?

নোনা জলে, সবদিকে জল আর জল, জল আর অন্ধকার। একজন চাপা গলায় বলে।

একে সমুদ্র বলে, আমরা সমুদ্রে আছি, সমুদ্র জলে, তুমি জান না।

কে বলল ?

কেন তিতলি...।

তিতলি তিতলি আমার মা।
খিল খিল খিল, তিতলি সোনা মা।
তিতলি তিতলি দোল দে।
জল পানিতে ঘুম দে।

অনিমেষের চোখের সামনে ফোটা ফুলের মতো চোখ দুটি বন্ধ হয়ে গেল। গুনগুন বন্ধ হয়ে গেল। সে বুঝল ঘুমের ভিতরে চলে গেছে তারা। সে তাকিয়েই থাকল। তখন সুদীপ্তা এসে তাকে ডাকল, তিতলি ফোন করেছিল।

চমকে ওঠে অনিমেষ, কই, কখন ?

৩

তিতলি বলল, বাবা আমাদের এই কোয়ার্টারের জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখা যায়।

জানি তো।

সাগরের জল সমস্ত দিন ঝিলমিল করে।

জানি তো, দেখতে পাইরে।

ইস দেখতে পাও, তুমি তো এলেই না।

মার্চের পর যাব তো, আর আন্দামানে তো গিয়েছি, তাই আর কী, তোরা কুয়ালালামপুর কি সিঙ্গাপুর গেলে যাব।

সে তো দেরি আছে বাবা, আমি তো বাবা এখন কলকাতায় ফিরব।

চলে আসবি ?

হ্যাঁ বাবা, এখানে সারাদিন একা, শ্বশুর শাশুড়ি তো অতদিন থাকতে পারবেন না, এখন বৈশাখের শেষ, আর সেই যে শীত, তারও পরে ফাল্গুনে।

চুপ করে থাকে অনিমেষ। অভিরূপও চেষ্টা করছে আন্দামান থেকে ফিরে আসার জন্য। এক কোম্পানি ওকে লান্ডান পাঠাবে বলছিল বড় পোস্ট দিয়ে। অভিরূপ আবার অত দূর যেতে চায় না। আসলে তার ভিতরে একটু হোম সিকনেস আছে। এইবার হয় তো সেও চলে আসবে ওখান থেকে। এই একটা সুযোগ। যাক, সে ওদের ব্যাপার, ওরা বুঝবে। তার হয়তো পোর্ট ব্লেয়ারে ওদের সংসার দেখতে যাওয়া হল না। না হতে পারে। আন্দামান তো সে যায় নি তা নয়। সব ছবির মতো আঁকা আছে মনে। খুব টাটকা। তিতলির বিয়ের বছর সাত আগেই সপরিবারে ঘুরে এসেছে। তখন তিতলি বছর আঠের। রস আইল্যান্ড, ভাইপার আইল্যান্ড, কোরাল আইল্যান্ড, হ্যাভলক, নীল, রঙ্গত, বারাটাং, প্রাচীন সেই অরণ্য, রেইন ট্রি, জারোয়া বুড়ো......, সেই দূর অতীত থেকে তার তাকিয়ে থাকা, দশ-বিশ হাজার বছর আগে থেকে। মনে পড়ে, সব মনে পড়ে।

তিতলি বলল, বাবা, এখন ঘর থেকে সমুদ্রের ঝিলমিল দেখতে কী ভাল লাগে।

বল, বলে যা।

রাতে মনে হয় সমস্ত শহর আলোয় ঝিলমিল করছে।

হ্যাঁ, জানি তো।

আমরা আগের উইকে গিয়েছিলাম সমুদ্রে, জাহাজে করে সেই প্রবাল দ্বীপে।

তারপর।

আমার এখন আবার যেতে ইচ্ছে করছে সেই জাহাজটায় করে সেই দ্বীপে, সেখানে সমুদ্রের নিচে প্রবাল আর রঙিন মাছ।

আমরা জানি।

জান তো কী হল, আবার জান বাবা।

ঠিক আছে বল, বলে যা, আমরা কোরাল আইল্যান্ডে গিয়েছিলাম পোরট ব্লেয়ার থেকে, তোর মনে নেই, তোর বিয়ের বছর সাত-আট আগে, ভুলে গেলি !

হ্যাঁ বাবা, কিন্তু আমার মনে হলো প্রথম গেলাম যেন, এই অবস্থায়, ও তুমি বুঝবে না, সেই দ্বীপের কথাই বলছি, কী অবাক না হয়েছিলাম, রোদে সমুদ্রের জল ঝিলমিল করছে, জলের নিচে প্রবাল আর কত সব রঙের মাছ, জীবিত প্রবাল, মৃত প্রবাল, জীবিত একটু সবুজের মতো, কাঁপছে।

হ্যাঁ, তোর তো মনে আছে সব।

এখন মনে পড়ে যাচ্ছে, গ্লাস বোটে আমরা দেখেছিলাম, আমি আর তুমি, মা আর তিতির যায় নি, কিন্তু আমার যে মনে হচ্ছিল এই প্রথম।

সত্যি বলছিস ?

মিথ্যে কেন বলব বাবা ?

তুই কি বিছানায় বসে আছিস?

না, আমি এঘর ওঘর করছি, অভিরূপ কম্পিউটারে, শাশুড়ী মা টিভি দেখছেন আর বাবা বই পড়ছেন।

অনিমেষ চুপ করে থাকে। তিতলি ঘুরছে মানে ওরা ঢেউয়ে দুলছে। দুলতে দুলতে ঘুমোচ্ছে। সে একটু বাদে বলল, আমাদের সঙ্গে প্রথমবার গেলি, তারপরেও তো গেছিস কয়েকবার।

হ্যাঁ, বাট সমুদ্রে ভেসে মনে হলো, আমি দেখছি যেন প্রথম, আমি যেন আগে কখনো প্রবাল দ্বীপে যাই নি, কিছুই চেনা মনে হল না।

কেন, এর ভিতরে ভুলে গেলি ?

ভুলি নি বাবা, কিন্তু এখন মনে হয় আমি দেখছিলাম না। তিতলি ফিসফিস করে বলে।

অনিমেষ অবাক, জিজ্ঞেস করল, তাহলে কে দেখছিল?

তিতলি গুনগুন করে বলে, এরা হতে পারে বাবা।

অনিমেষের বুক দুরদুর করে ওঠে, অস্ফুট উচ্চারণ করে সে, ওরা, সত্যি !

হ্যাঁ বাবা, তুমিই বুঝবে বাবা, তা না হলে চেনা কোরাল আই ল্যাণ্ড অচেনা হয়ে যাবে কেন, এরা দুজন যেমন আমার থেকে খাবার পায়, আমার থেকে অক্সিজেন পায়, আমার চোখে দ্যাখেও বাবা।

তুই টের পাস?

কখনো কখনো, কখনো আমার মনে হয় এলেম নতুন দেশে। বলে তিতলি।

আহা, কী বললি, বল, তারপর ?

কী বলব, শিহরণ তিতলি বলে।

প্রবালের প্রাণ কাঁপছিল জলের নিচে?

হ্যাঁ বাবা।

সমুদ্রে প্রাণ আর প্রাণ !

হ্যাঁ, ঠিক তাই। তিতলি বলল।

অনিমেষ এবার বলে, তুই দেখছিলি না তো খুকি, তারা দেখছিল। জননীই সমস্ত কিছু চেনায় যে। সেই তাদের নিয়েই তো তিতলি গিয়েছিল কোরাল আইল্যান্ডে। তাদের তো সেই প্রথম দেখা। মায়ের চোখের ভিতর দিয়ে।

তিতলি বলে, আবার বলতে ইচ্ছে করছে, কী সুন্দর ঝিলমিল করছে, বাবা সেই যে গানটা, শচীন দেববর্মণের গান, ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলের জলে ঢেউ খেলিয়া যায় রে, আমি এখন শুনব, ওই গান আর সলিল চৌধুরীর সুরে হেমন্তর গান, ধিতাং ধিতাং বোলে...।

তুই তো শুনিস নি আর একটা গান।

কী গান বাবা ?

না থাক।

আচ্ছা থাক। বলে চুপ করে গেল দূর দ্বীপবাসিনী তার মেয়েটি। সেই যে সেই শবে বরাতের রাতে বাজি-পটকা ফুটছিল, আলোয় সেজেছিল কোনো কোনো পল্লী। তিতলি জন্মাল তাই হয় তো। হাসপাতালের মস্ত লম্বা সিঁড়িতে বসেছিল সে অনিমেষ আর তার বন্ধু সুসীম। সে এখন বেঁচে নেই। মাথার ভিতরে টিউমার, ছ-মাসে শেষ। কতটুকু বয়স তার তখন, পঁয়তিরিশ হবে। তার বউ নীলিমার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। সে চার বছরের ছেলে নিয়ে বহরমপুরে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল। আর আসেইনি এই শহরে বোধ হয়। শুনেছে ওখানে একটি স্কুলে চাকরি পেয়েছে সে।

আমি রাখছি বাবা, আমার ঘুম আসছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই ঘুমো, আর জাগিস না।

গুড নাইট বাবা। বলে সে চুপ করে গেল। ফোন কেটে গেল।

সুদীপ্তা বলল, কথা আর শেষ হয় না, ওকে এত রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখা ঠিক না।

আমি একবার ওকে রেখে দিতে বলেছিলাম, মনে নেই তোমার, তারপর সাত দিন ফোন করে নি।

সুদীপ্তা বলল, কিন্তু এখন তো ও একা নয়।

হ্যাঁ এখন সে একা নয়। সেদিন রাতে সবাই ঘুমিয়ে গেলে আচমকা ঘুম ভেঙে গেল অনিমেষ চৌধুরীর। তিতির আলাদা ঘুমোয়। সে রাত জেগে পড়ে। এখন রাত দেড়টা। এখন তিতিরের ঘুমিয়ে যাওয়ার কথা নয়। অনেক দিনই এই সময় ঘুম ভাঙলে সে দেখেছে তিতির পড়ছে। হয় তো তা সতীনাথ ভাদুড়ীর অচিন রাগিনী হতে পারে বা আন্তন চেখভের গল্প হতে পারে, কিন্তু সে জেগে আছে। আজ তার ঘরের আলো নেভান। কম্পিউটার থাকে তিন ঘরের ফ্ল্যাটের আলাদা ঘরে। কী মনে হল অনিমেষের সে কম্পিউটার রুমে গিয়ে আলো জ্বেলে কম্পিউটার অন করল। ই-মেইল খুলে তিতলির পাঠানো সেই মেইল আবার ওপেন করল, মনিটর জুড়ে সেই দুই মেঘ। মেঘ না প্রবাল। জীবিত প্রবাল কিংবা প্রাণী কোষ। সে তাকিয়ে থাকল। তার গ্র্যান্ড চাইল্ড—তাদের প্রাণ। তার নিজের প্রাণ আছে ওদের ভিতরে। প্রাণকে এই ভাবে কি চোখে দেখা যায় ? প্রাণবায়ু জমাট বেঁধে আছে। আর সেই জমাট প্রাণ বায়ু যেন কেঁপে উঠল, এই তুমি কে গো ?

আমি অনিমেষ।

অনিমেষ কী ?

অনিমেষ বলল, আমি তোমাদের গ্র্যান্ড পা।

তার মানে কি জল ? ফিক করে হেসে দিল একজন, তুমি কি সমুদ্দুর?

সমুদ্র, জল মানে ? অনিমেষ ভ্যাবলা হয়ে মধ্যরাতে জিজ্ঞেস করল।

দোল দেয়। একজন বলল, ঝিলমিল করে ঢেউ দেয়, তুমি কি সে?

ঢেউ নেই এখন, তুমি আমাদের দোল দেবে ? অন্যজন বলল।

অনিমেষ বলল, আমি তো জল নই, তোমরা জল, জমে জমে মেঘ হয়েছ।

তুমি আমাদের দোল দাও, আমরা একটু ঘুমোই।

আহা, অনিমেষ কী করে দোল দেয় ? তিতলি ঘুমিয়েছে। তিতলি না ঘুমোলে ওরা দোল পেত। হ্যাঁ তাই। ওরা তো মহাসমুদ্রে ভাসছে। জীবন সমুদ্রে। পাশাপাশি দুই কোটরে দুইজনায়। সেই জল দুলছে না এখন তাই ওরা জেগে আছে। ওদের মা জেগে থাকলে তার নড়াচড়ায় অবিরাম দুলুনি, সেই দুলুনি এখন থেমে গেছে। মহাসমুদ্র নিস্তরঙ্গ। জলে এখন ঢেউ নেই। দুলুনি নেই। ওদের ঘুম নেই। ওদের মা তিতলি নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে।

ঘুমোচ্ছে দ্বীপের পর দ্বীপ। হ্যাভলক, নীল বারাটাং, প্রাচীন অরণ্য পাহাড়, জারোয়া, নিকোবরী, আদিম উপজাতি, সমুদ্র আর সমুদ্র পাখি। এখন টেলিফোন বাজিয়ে কি ঘুম ভাঙিয়ে দেবে অনিমেষ ? তা বড় নিষ্ঠুর কাজ হবে। সে তাকিয়ে আছে দুই প্রাণবায়ুর দিকে। তারা জেগে আছে প্রাচীন, ঘুমহীন উপজাতি বুড়োর মতো। হাজার হাজার বছর ধরে যার ঘুম নেই। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তাদের জাগরণ। আর জেগে আছে একটি বুড়ো কাক, মাঝরাতেও সে খেপে খেপে জেগে ওঠে, ডাক দেয়, খোঁজ নেয় ভোর হল কিনা। জারোয়া বুড়ো বলে, থাম থাম, জাগাস নে, জগৎ ঘুমায়, সমুদ্দুর আপন মনে ঢেউ দেয়।

এই যে তুমি, কী যেন তুমি ? ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কানে এল।

কী বলছ, আমি অনিমেষ।

হ্যাঁ অনিমেষ, অনি, তুমি আমাদের ঢেউ দাও, ঢেউ দিয়রে দিয়রে।

অনিমেষ বলল, তোমাদের মা ঘুমিয়ে যে।

মা কে ?

তিতলি।

হ্যাঁ তিতলি, ও সমুদ্দুরে রেখেছে আমাদের, অনি তুমি তাহলে গান দাও।

গান ! বিস্মিত হয়ে অনিমেষ দেখতে পায় দুটি দুটি চারটি সজল চোখ তার দিকে তাকিয়ে। সে গুনগুনিয়ে ওঠে, ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলের জলে......।

একজন বলে, ঝিল নয় নদী।

আর একজন বলে, সমুদ্দুর।

নদী কী গো, তিতলি যে অভিকে বলে ?

আর সমুদ্র কী গো, অভি যে তিতলিকে বলে ?

অনিমেষ চৌধুরী মেইলের রিপ্লাই দিতে বসল, নদী মানে যা সাগরে গিয়ে মিশে যায়, তোমরা আছ মহাসমুদ্রে। মহাসিন্ধুর ভিতরে। পৃথিবীতে প্রাণের উন্মেষ ঘটাতে এসেছ তোমরা। এখন মহাপৃথিবী মানে মহাসমুদ্র, পৃথিবীর সবটাই জল, পৃথিবীতে শুধুই রাত্রি, ঊষাকালের জন্ম হতে অনেক মুর্হূত, দন্ড, অনেক পল অনুপল, আকাশে শুধু জেগে আছে আবছা নীল আলো, এই তোমরা একজন ঝিলমিল, আর একজন কী গো ?

একজন বলল, ধিতাং, যখন সেই গান হয়, আচ্ছা গান কী ?

তোমরাই গান।

অনিমেষ লিখল, ধিতাং আর ঝিলমিলের সঙ্গে দেখা হল আমার রাত দুটোতে। তারা তখনো জেগে ছিল মহাসমুদ্রে, বাকি সব ঘুমিয়ে, সেই যে দ্বীপের পর দ্বীপ সেই যে পাহাড় অরণ্য আকাশ......সব। তাদের সঙ্গে কথা হল। তারা ঢেউ চাইছিল। ঢেউ দিলে ঘুম এসে যায়......তিতলি আজ আর আমার ঘুম আসবে না। আমার মনে পড়ে যাচ্ছে রে খুকি। তোকে আদর করে তোর ঠাম্মা ডাকত খুকি, এক একসময়। হ্যাঁরে খুকি আমি

এদের সঙ্গে জেগে আছি। বুড়ো জারোয়ার মতো জেগে আছি। আর জেগে আছে পরেশনাথ মন্দিরের পাঁচিলের ধারের পাম ট্রিতে এক বুড়ো কাক...... সেই এক অনন্ত জাগরণে, আমার নিজের কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে রে খুকি।

রিপ্লাই সেন্ড করল অনিমেষ। ইওর মেসেজ হ্যাজ বিন সেন্ড, ভিউ মেসেজ। মুহূর্তে ধিতাং আর ঝিলমিল উধাও। ইনবক্সে পৌঁছে গেল অনিমেষ।

৪

কী বলল ও ? একজন পর্দার আড়াল থেকে জিজ্ঞেস করল।

কী জানি মনে নেই। অন্যজন বলে।

এখন সব চুপচাপ কেন ? সে জিজ্ঞেস করে।

ঘুমিয়ে আছে সব। এ বলল।

আমরা ঘুমোব না ? সে জিজ্ঞেস করে।

ঘুম পাড়াবে কে ? একজন বলে।

সেই তিতলি কই ? অন্যজন জিজ্ঞেস করে।

তিতলি এখন ঘুমায়। একজন বলে।

জাগবে কখন ? অন্যজন জিজ্ঞেস করে।

একজন জিজ্ঞেস করে, আমরা জাগালে জাগবে।

সে আর এ, দুই ভ্রূণ, দুই প্রাণ দুই ঘরে। মাঝে একটি পর্দা। পর্দার গায়ে ভেসে গিয়ে একে অন্যের সঙ্গে কথা বলে। তিতলি তখন ঘুমোয়। একজন বলে,

তিতলি, তিতলি, করলি কী
আর একজন বলে, অবেলার ঘুম ঘুমালি কি ?
তিতলি তিতলি, একটা মা।
নীল জামা আর লাল জামা।
ধিতাং ঝিল বলে এই।
তা ধেই ধেই...ধেই ধেই। ....।

তিতলি বলে, রাত দুপুরে না ঘুমিয়ে বাবা এই মেইল করেছে দ্যাখো।

তিতলির স্বামী, অভিরূপের অফিস নেই। যায় নি। ইচ্ছে হল তাই গেল না। অমন সংবাদে কেউ যেতে চায় অফিস। বাড়িতে বসে নেটে অফিসের কাজ করছে। এখন কলকাতা ফেরার আয়োজন করতে হবে। অভিও যাবে। ফিরেও আসবে, কিন্তু পাকাপাকি যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সে চেষ্টা করছে অনেকদিন, আন্দামান থেকে ফিরতে। বিয়ের আগে থেকে সে এখানে। আর কতদিন। তিতলির অবশ্য ভাল লেগেছে এই দ্বীপপুঞ্জ। কী চমৎকার সি বিচ করভিন্স। আর এতদূরে থেকে ধরাই যায় না বাংলাদেশের বাইরে আছে।

যশোর খুলনা ফরিদপুর বরিশালের লোক দ্বীপে দ্বীপে বসত করেছে। সুপারী বাগান আর নারকেল বাগানে ভরা দ্বীপগুলি। আর ট্যুরিস্টরা তো এসেই যাচ্ছে। সে হ্যাভলক দ্বীপে তিনবার তিনটি পূর্ণিমা কাটিয়েছে। সেই চাঁদ আর মেঘের রাত কী অপূর্ব। পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষা শুনতে তার দারুন লাগে । এত বছরেও লোকগুলো নিজেদের ভাষা ভোলে নি। সব চেয়ে ভাল তার সমুদ্রমুখী জানালা ও ব্যালকনি। অভিরূপ আর থাকতে চায় না পোর্ট ব্লেয়ার। তিতলির জন্যই থাকা। এবার অভিরূপ কলকাতায় ফিরে বিদেশ যাত্রা করবে। মনে মনে সেই পরিকল্পনা আছে। দুজন দুজন চারজন মিলে হল্যান্ড চলে যাবে। আমস্টারডম, সমুদ্র আর নিঝুম পৃথিবী। দুইজন আর দুইজন আর মহাসমুদ্রের তীর। অভিরূপ আমস্টারডম ভেবে রেখেছে। তার এক বন্ধু ওই দেশে আছে। বন্ধুর স্ত্রী সম্বিতা একটি বই লিখেছে আমস্টারডম-এর পাশের শহর ফুরবারগ নিয়ে। সেই বইটা তাকে পাঠিয়েছিল তুষার। পড়ে মনে হয়েছিল, আর নয় পোর্ট ব্লেয়ার। সে যেমন ছাত্র, যেমন গুণী কর্মী। তার জন্য বসে আছে বহুজাতিক কোম্পানি। এই যে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে তারা যাচ্ছে, অভিরূপ কলকাতায় গিয়ে অন লাইন ইন্টারভিউ দেবে। কলকাতা বা ভুবনেশ্বর কোথাও আপাতত এক দেড় বছর। তারপর হল্যান্ড। তুষার বলছে, অভিরূপ আসতে চাইলেই হয়। কাজ তার জন্য অপেক্ষা করছে।

তিতলি বলল, দূর ভাল লাগছে না।

কেন, কলকাতায় ফিরছ , নিজের শহর নিজের বাড়ি।

আমার মনে হচ্ছে এখানে থেকে যাই, এত সমুদ্র আছে কোথাও ?

কিন্তু এখন এখানে থাকব কী ভাবে, বড় ডাক্তার, লোকজন কোথায় এখানে ?

জানি না, আমার এই ব্যালকনি আর জানালা, বে অফ বেঙ্গল, ওই যে অবিরাম জল দুলছে, আমার ঘুম এসে যায় কী সুন্দর।

অভিরূপ অবাক, ঘুম এসে যায় মানে, ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে ঘুম পায় তোমার ?

যাহ, আমার কেন?

তাহলে কার ?

তাদের, ধিতাং আর ঝিলমিলের।

তারা কারা? অভিরূপ অবাক। কিছুই বুঝতে পারছে না।

তারা কারা মানে, তুমি জান না !

যাহ, সবে তো ভ্রূণ, তুমি টুইনের কথা বলছ ?

হ্যাঁ, তাদের ফিল করি না?

ফিল করো ?

হ্যাঁ। বলে হাঁটতে লাগল তিতলি। ঘর থেকে ব্যালকনি গেল। ব্যালকনিতে দাঁড়াল। এখন বেলা শেষের দিক। সমুদ্রের জলের নীল শুষে নিয়েছে মার্চের দুপুরের আলো। আজ আকাশ ঝকঝকে। কী সুন্দর সব রঙিন পতাকা ওড়ান দুটি বোট ঝিলমিল ঝিলমিল সমুদ্রের জলে ভেসে আছে। একটি বোটের একদিকে ঝিলমিল অন্যদিকে ধিতাং। হাসল নিজের মনে তিতলি। ইস, এই কথা যদি শোনে অভিরূপ, বলবে তিতলি স্বপ্ন দেখছে ঠিক দুপুরে ব্যালকনির ঘুমে। সে যে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ঘুমায় তা বোঝা গেল। তিতলি মনে মনে বলল, ঘুমাই তো, আমি ঘুমালে তারা জাগে, আমি জাগলে তারা ঘুমায়, তারা জাগলে সমুদ্রে ভেসে বেড়ায়। নীল পতাকা লাল পতাকা উড়িয়ে চলে জলে জলে। ওই যে ওই পতাকা ওড়ান নৌকো নিয়ে তারা দোল খায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে। চলে গেলে এই সমুদ্র তো আর পাবে না তিতলি। এখানে আসার পর থেকে, তা বছর দুই পার হয়ে গেছে, আরো তিন মাস, সে এই সমুদ্র নিয়ে আছে। ডিসেম্বরে এসেছিল। এখানে শীত আসে না। বর্ষার মেঘ আসে আর যায়। সেই জন্য সমুদ্রও তার রূপ বদল করে অবিরত। দুপুরভর সমুদ্র দেখাই তার কাজ। নেশা। বিছানায় বসেও সমুদ্র দেখতে পাওয়া যায়। সারাদিন সমুদ্র, সারারাত সমুদ্র, ঘুম ভাঙলে সমুদ্র, ঘুমের ভিতরও সমুদ্র। সেই সমুদ্র কখনো নীল, কখনো ঘোলাটে, কখনো মেঘের রঙে কালো, কখনো শ্যাওলার রঙে আবছা সবুজ। তিতলি বলল, আমি চলে গেলে, ওরা কী করে আর রঙিন পাল ওড়াবে সমুদ্রে ? ওরা যে সমুদ্র থেকেই এসেছে আমার কাছে। কথাটা জানে তিতলি একা। আর কেউ না।

অভিরূপ তার পাশে এসে দাঁড়ায়, বলল, নাম দুটো কে দিল, ধিতাং আর ঝিলমিল?

তিতলি বলল, ওরা নিজেরা নিয়েছে।

হে হে করে হাসল অভিরূপ, ওরা নিজেরা নিয়েছে, তারপর?

আমি জানি না, ওই যে গান শুনি, ওই গান থেকে তারা নিয়েছে।

বাহ, কিন্তু আর কাউকে বল না, জন্মানর আগে নাম দিতে নেই।

ওরা তো জন্মে গেছে অভি, প্রাণ টের পাই।

পৃথিবীতে আসুক।

তিতলি বলল, এসে গেছে অভি।

ভূমিষ্ঠ হোক।

ওরা তো জলে ভাসছে, এই আসা কি আসা নয়?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসা, আসা। অভিরূপ চুপ করে যায়।

তিতলি ঘরে ফেরে। বিছানায় বসে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে। একদিন, সে মাসখানেক আগে, মাঝরাতে তার ঘুম ভেঙে গেল। বৃষ্টি নেমেছিল গভীর রাতে। হাওয়া উঠেছিল খুব। বাতাস আসছিল জানালা দিয়ে। সে জানালা বন্ধ করতে যাবে তো জানালায় গিয়ে থ। হাওয়া আচমকা থেমে গেল। ইস হাওয়া আর মেঘ ছিল কিনা ধরাই গেল না

জানালায় এসে। দেখল শুক্ল পক্ষের প্রতিপদের সরু একফালি চাঁদ জেগে আছে আকাশে। ডিঙি নৌকো। সে যেন এক আলোর ডিঙা। আবছা চাঁদের আলোয় সমুদ্র থির হয়ে আছে। আহা সে যে কী সুন্দর। তার মনে হল, কবিতা লেখে বোন তিতিরের মতো। তিতির হলে ঠিক লিখত। অথচ তার যে ইচ্ছে হচ্ছে লিখতে। কী লিখবে সে কী ভাবে লিখবে ? কবিতা লিখতে গেলে কি সমস্ত মন আর প্রাণ জুড়ে অমন আকুলতা হয়। হৃদয় জুড়ে...। সে দেখল, কেউ জানে না, সে জানে। সে জানে আর তারা জানে, তারা ভাসতে ভাসতে এল। কেউ জানে না, কেউ না। অভিরূপ ঘুমিয়েছে। ঘুমোলে আর তার সাড় থাকে না। সে জানলই না, সমুদ্র উঠে এল সমস্ত কিছুতে। আকাশ আর সমুদ্র এক হয়ে গেল। শূন্যতা আর শূন্যতা থাকল না। সমুদ্র হয়ে গেল। চাঁদ, ঠিক যেন সমুদ্রের জলে ভাসছে। একটি নয় দুইটি চাঁদ। দুইটি নয় অনেক চাঁদ। সহস্র চাঁদ। জলে ঝিলমিল করছে তারা। তার ভিতরে দুইটি চাঁদ ভাসতে ভাসতে এল তার জানালায়। জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল সমুদ্র নিয়ে। তাকে ডুবিয়ে দিল সমুদ্রে। আলোর দুই ডিঙা তার গায়ে এসে ভিড়ল। তারপর ? হৃদয় জুড়ে......এ এ এ। তার আর মনে নেই। সত্যি মনে নেই। ঘুম ভাঙল। অভিরূপের গায়ে হাত দিল। সমস্ত গায়ে কেমন যেন হচ্ছে। শুনছ, তুমি শুনছ। অভিরূপের ঘুমই ভাঙেনি। তার আর ঘুম আসেনি সেই রাতে। জেগে ছিল। চাঁদ ভেসেছিল জানালার বাইরে। তারা তিনতলায় মস্ত ফ্ল্যাটে থাকে। তিনখানি ঘর, মস্ত ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম। তারা একটি ঘরে একটি খাটে শোয়। বাকি ঘরদুটিতে কেউ না। ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুমেও কেউ না। খাট আলমারি, সোফাসেট, চেয়ার টেবিল, শো-কেস---এই সবে ভরে আছে। আর আছে দীর্ঘ রাত আর দীর্ঘ দুপুরজুড়ে নির্জনতা। দুপুরে তবু সে থাকে, এ ঘর ও ঘর করে, রাতে কেউ নেই। আছে কিছু পুতুল। তার ছেলেবেলার পুতুল। সে খুব গুছানি মেয়ে। খুব সামলে রাখে, গুছিয়ে রাখে। সেই পুতুলখেলার বয়সের পুতুলগুলো তার কাছে যত্নে ছিল ও বাড়িতে। তিতিরও সব নষ্ট করতে পারে নি। তিতির তার উলটো। অথচ সে কবিতা লেখে। কিন্তু তার কত পুতুল নষ্ট করেছে সেই ছোটবেলায়। আবার রেখেছেও। তার বিয়ের সময় তত্ত্বের সঙ্গে তার ও তিতিরের পুতুল মা তাকে দিয়ে দিয়েছিল। আর সেই সব পুতুল নিয়ে সে আন্দামান। খরগোস, ভালুক, লেজঝোলা পাখি, সেই পাখির গায়ে কত রঙের পালক। বানর, কুকুর, বারবি পুতুল---কত কী। সেই সব পুতুল সারা দুপুর তার সঙ্গে থাকে। সে ঘুরলে তার পায়ে পায়ে ঘোরে কুকুর। সে এক লোমওয়ালা স্পিতজ। ভালুক গায়ে গায়ে ঘোরে। বাঘ চোখ জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে থাকে। তার ভয়ে হালুম করতে পারে না। আবার বারবিকে নিয়ে সে বিছানায় এক ফাঁকে গড়িয়ে নেয়। ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা…গান গেয়ে গেয়ে ঘুম পাড়ায়। ঘুম আয় ঘুম আয় আয় ঘুম আয় রে......জেলেবাড়ির ছেলে ঘুমোয় জাল মুড়ি দিয়ে, না না না, ঝালমুড়ি খেয়ে। তার বাবা তাকে অমন ভাবে ঘুম পাড়াত। তো এ তো দুপুরের কথা। সেই রাতে কী হল। সে এসে শুয়েছিল অভির পাশে।

তাকিয়ে ছিল জানালার শার্সি দিয়ে। আকাশ ঝলমল করছিল তারায়। কিন্তু আচমকা সেই তারারা ঢেকে গেল মেঘে। আন্দামানে সুনামীর পর আকাশের মতি বোঝা ভার। গতির কোনো দিক নেই। দিশেহারা হয়ে গেছে সব। কখন বৃষ্টি কখন পরিষ্কার আকাশ তা ধরাই যায় না। সেই রাতে আবার মেঘ এল। অভি ঘুরে তাকে জড়িয়ে শুলো। কিন্তু তার ঘুম ভাঙেনি এক ফোটাও। তাই অভি জানত না, জানতেও পারল না তিতলির কী হলো। তিতলি কি ঘুমোল, না জেগে থাকল ? কোনোটাই জানে না তিতলি। মনে হয় সে জেগে ছিল। মনে হয় সে ঘুমিয়ে ছিল। ঘুম আর জাগরনের ভিতর ছিল। অন্ধকারে ভালুক কুকুর বানর আর লেজঝোলা পাখির জেগে ওঠা টের পেল। তা জেগে থেকেও হতে পারে, না জেগে না ঘুমিয়েও হতে পারে। শুনতে পাচ্ছিল, চুপ চুপ চুপ, তিতলি জেগে যাবে। তখন একজন খিল খিল খিল, অন্য কেউ তার মুখে হাত চাপা দিল। আহ, কী করিস, ওরা জেগে যাবে। তখন বানর না ভালুক কে বলল, কতদিন খেলিনি, আয় তোরা আমাদের নিয়ে খেল……হৃদয় জুড়ে…। কে যেন গুনগুন করতে লাগল, জেলেদের ছেলে ঘুমোয় জালমুড়ি দিয়ে। জালমুড়ি দিয়ে সোনা ঝালমুড়ি খেয়ে। ওরা কারা ? সে যে উঠবে, পারে না। অভি তাকে আটকে রেখেছে। আবার সে যে ঘুমিয়ে তখন, উঠবে কী করে ? হৃদয় জুড়ে……। ঘরময় অন্ধকারে হুটোপুটি। ভালুক, বানর, কুকুর, বাঘ, সিংহ, বেড়াল ছুটছে তাদের পিছু পিছু। তারা খেলছে অন্ধকারে। বাঘ ভালুক বানর কুকুরের হাতে পায়ে খিল ধরে গিয়েছিল, তারাও ছুটছে অনেকদিন বাদে। এতদিনে তারা খেলার সাথী পেল। সেই তিতলি কবে বড় হয়ে গেল, তারা চুপ করে গেল, খেলার আর কেউ নেই। তিতলির বোন তিতির, তার ভয়ে ওরা সিটিয়ে থাকত ওরা। সে ছিল খুব দুষ্টু। বাঘকে ছুড়ে ফেলত, আর হালুম করবি, করবি, বল। বানরের লেজ ধরে টানত, আর দুষ্টুমি করবি, বল, কান ধর……, লেজঝোলা পাখিকে বলত, চুপ চুপ চুপ, না হলে জানালা দিয়ে উড়িয়ে দেব…। তারা অনেকদিন বাদে সাথী পেয়ে গেছে। একরত্তি দুইজন এসেছে তিতলির কাছ থেকে। ইস ঠিক যেন তিতলি সেই ছোটবেলায়, এই, খেলবি তো আয়।

৫

হ্যাঁ, তিতলি জানে তাই। সেই রাতেই চাঁদের ডিঙায় ভেসে তারা এসেছিল তার ঘরে। এসেই খেলা। খেলা আর খেলা। উফ, মা বলত, শুধু খেলা আর খেলা। একটু বই-এর সামনে বসবে না। তাই শুনে ঠাম্মা বুড়ি বলে উঠত, খেলবেই তো, খেলতে এসেছে বউমা, না খেলে করবে কী ? বইটই সব পরে হবে। সারাজীবন পড়ে আছে। কিন্তু ঠাম্মা জানত না, সে সারাজীবন খেলেই যাবে। সেই পুতুল নিয়ে আন্দামান কেন হল্যান্ড যাবে, সুইৎজারল্যান্ড যাবে। পুতুল নিয়ে বড় হল, পুতুল নিয়ে বউ হল। পুতুল নিয়ে মা হবে, পুতুল নিয়েই বুড়ি হবে।

অভিরূপ জানে না, কবে কখন কী ভাবে এই দুজন এল। কিন্তু তার ক'দিন পর তার মা বাবা এলে মা-ই বলল, খাওয়ায় রুচি নেই, বমি করল, এখন বলছে...তুই ওকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যা অভি।

শুনে তিতলি বলে, না মা না, না।

আর একটু অপেক্ষা করা যাক। আর একটু। কিন্তু ক'দিন বাদে যেতেই হল। সে আর অভি গেল। যা যা টেস্ট তা হলো। আর দুদিন বাদে রির্পোট এল। ভ্রুণের ছবি তুলে দেখিয়ে দিল, একজন নয় দুজন, যমজ অরুণ বরুণ কিংবা কিরণমালা হিরণমালা। না, চম্পা চামেলী, কিংবা লালকমল নীলকমল। তা কেন চাঁদ আর চম্পা। ভাই বোন। কতরকম কথা হল স্বামী স্ত্রীতে। আহা, সন্তান আসছে। মানুষ একটি নয় দুটি। মানুষের জন্ম দেবে তারা। তুমি ম্যাক্সিম গোরকির মানুষের জন্ম পড়েছ তিতলি ?

হ্যাঁ, কেন পড়ব না ? মানুষের জন্ম, চেলকাশ, সমুদ্রতীরে এক সন্ধ্যা...।বাবা এইসব গল্প আমাকে পড়িয়েছিল, রুশ বই, কত বই পড়েছি বড় হতে হতে।

এখন তোমায় আবার পড়তে হবে এমন যাতে মন ভাল থাকে।

তিতলি তখন অভির গলা জড়িয়ে ধরে আমার মন এখন খুব ভাল।

হ্যাঁ, গান শুনবে, বাজনা শুনবে।

শুনব শুনব। তিতলি বলে।

সারাদিন আমজাদের সরোদ কিংবা রবিশঙ্করের সেতার বাজবে ধীরে ধীরে।

বাজবে বাজবে, সারাদিন শুনব। বলে খিলখিল করে হাসতে লাগল একজন, এই কথা শুনছিস।

না শুনি নি, শুনতে নেই না। সে বলল।

কে বলল শুনতে নেই। অন্যজন জিজ্ঞেস করে। অন্যজন মানে ধিতাং।

অত আমার মনে নেই। সে বলল। সে মানে ঝিলমিল।

তারা সমুদ্রের ভিতরে দুই দ্বীপে থাকে যেন। মাতৃর্গভ এক মহাসমুদ্র। সেই সমুদ্রের ভিতর দুইটি দ্বীপে যেন দুইজন থাকে। এই বঙ্গোপসাগরে তো কত দ্বীপ! তার ক'টিতেই বা মানুষ থাকে। দুই র্নিজন দ্বীপ যেন দুই সোনার বাসভূমি। এমনি কত রকম কল্পনা করে তিতির সারাদিন ধরে। রাতে কথা বলতে বলতে অভি ঘুমোলে দুই সোনা যেন চাঁদের ডিঙা বায়। একজন ডিঙা বেয়ে আর একজনের দ্বীপে যায়। আর একজন ডিঙা বেয়ে অন্যজনের দ্বীপে যায়। কেউ কাউকে দেখতে পায় না, দ্বীপে দ্বীপে আলাদা যে তারা, কিন্তু জলের ভিতর ভেসে ছুঁয়ে দিতে পারে যেন। দেওয়াল ছুঁয়ে একে অন্যকে অনুভব করে। অভি ঘুমোল পাড়া জুড়োল......বাঘ সিংহ, ভালুক বানর, পাখি, শিম্পাঞ্জিরা সব জেগে ওঠে। তাদের সঙ্গে টুকি টুকি করে দুইজনায়। অভি আমি যাব সব খেলনা নিয়ে।

হ্যাঁ, খেলনা যাবে। অভি বলল।

অভি অভি আমি যাব সমুদ্র নিয়ে।

আহা, যাবে যাবে, কলকাতায় তো সমুদ্র নেই।

নেই তো আমি কলকাতায় যাব না। তিতলি বলে।

মিঃ চন্দ আর মিসেস চন্দ, অভির বাবা অভির মা উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছেন। উফ, এমন আনন্দের খবর কতদিন আসে নি। তাঁরা প্রথম ফোন করেছিলেন তিতলির বাবাকে, অনিমেষ তখন জয়ন্তী নদীর ভিতরে, তাকে ধরা যায় নি। না পেয়ে তিতলির মা সুদীপ্তাকে ফোনে জানিয়েছিলেন মিসেস চন্দ ও মিঃ চন্দ। আনন্দে তাঁরা হৈ হৈ করছিলেন। সেই কথা তো আগেই বলা। তারপর তাঁরা তাদের দেশের বাড়িতে মায়ের কাছে ফোন করলেন। ছিয়াশি বছরের মা। মা সরসীবালা এখনো সুস্থ। হেঁটে চলে বেড়ান । দেশ তো সেই ফুলবনি। ফুলবনিতে চন্দ পাড়া। অনেকঘর। অভির খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইরা থাকে কেউ কেউ। আবার তারা থাকেও না। চাকরি করে বাইরে। দুচার মাস বাদে বাদে আসে মাকে দেখতে, বাবাকে দেখতে। আসলে ফুলবনি এখন বৃদ্ধাবাস। কিন্তু সেই সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সবাই খুব সর্মথ আছেন। আর পরস্পরকে জড়িয়ে আছেন। কলকাতা এলে অভির ঠাকুমার দম বন্ধ হয়ে আসে। জেঠা-জেঠিরাও কলকাতা পছন্দ করেন না। ফুলবনিতে তাঁদের শিকড়। সে হল লালমাটি আর শালবনের দেশ। সে হল ধান আর অন্ন, অন্ন আর নবান্নের দেশ। সেখানে যেমন শীত তেমনি গরম। কুয়োর জল শীতে গরম আর গরমে শীতল। সেই ফুলবনিতে খবর হয়ে গেছে। অনেক অনেকদিন বাদে একজন নয় দুজন আসছে ফুলবনির ঘরে। অভির ঠাকুমা শুনে সেই অঘ্রান মাসে ঘর-দুয়ারে দীপ জ্বালাতে বললেন, ও মেজ খোকা, আলো দে আলো, একজন না একসঙ্গে দুজন, আলো দে। খুব আনন্দ করতে লাগলেন সবাই। বুড়োরা তাসের আড্ডায়, বুড়িরা গোল হয়ে বসে গুনগুন করতে লাগলেন, ইস, কতদিন বাদে আসছে একজন, আয় আয় চাঁদ টি দিয়ে যা।

ওমা তাই ! জিজ্ঞেস করল তিতলি তার শাশুড়িকে।

হ্যাঁরে তাই। মিসেস মাধবী চন্দ বললেন, সবাই খুব আনন্দ করছে।

দুপুরে শাশুড়ি-বউ-য়ে কথা হয়। কথা বলতে বলতে তিতলি ব্যালকনিতে চেয়ারে বসেই সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে হয়, ওই যে রঙিন পাল তোলা সাম্পান, ওই সাম্পান তাদের। দুই দিকে দুইজনে বসে পাড়ি দিচ্ছে সাগর। ঝিলমিল আর ধিতাং। সরোদ বাজছে আমজাদ আলি খাঁর। রাগ রাগেশ্রী। আহা, সেই বাজনা শুনে তারা হাল ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে একটু একটু করে। এবার সাগর যেখানে নিয়ে যাবে। পালে হাওয়া লেগে সাম্পান যেখানে যাবে। যেখানেই যাক, সমুদ্র তো। তারা সমুদ্রে জন্মেছে। সবুজ শ্যাওলার মতো কত কোটি বছর আগে কত জন্ম আগে সমুদ্রজলে ভেসেছিল তাঁরা। সমুদ্র তাদের চেনা। সাত সমুদ্র আর উপসমুদ্র কত, হ্রদ---জলে জলে ঘেরা পৃথিবী। সেই পৃথিবীতে সাম্পান ভেসে বেড়াবে নিজমনে।

মা, তারা ঘুমিয়েছে। তিতলি বলে।

এখন কী করে টের পাবি, ও তিতলি ?

তিতলি বলে, মনে হয় যেন।

কী করে মনে হবে রে?

তিতলি বলে, আমি যেন দেখতে পাই মা।

তাই বা কী করে পাবিরে, সবে তো একবিন্দু ?

তিতলি ফিসফিসিয়ে বলল, পাই মা, পাই।

তাই শুনে শাশুড়ি হাসেন, বলেন, মনে মনে ফিল করিস ?

তিতলি চুপ করে থাকে, সে তো রাতে তাদের হুটোপুটি শোনে, সে তো ওই দেখছে তাদের ছায়া ছায়া। ওই যে সমুদ্রে পাল তুলেছে চাঁদের ডিঙা। সে ডিঙার ছায়া দেখতে পাচ্ছে। বলবে নাকি শাশুড়িমাকে? শুনবেন তাঁর কথা? বিশ্বাস করবেন ? সে তো অভিরূপকেও বলে নি। নিজের সিন্দুকে লুকিয়ে রেখেছে। তার একটা সিন্দুক আছে মনের ভিতরে। তার ভিতরে সে সেই বালিকাবেলা থেকে রঙ জমায়। কত রঙ। রঙের বাতাস। রঙের আলো। রঙের পুতুল। রঙের সাম্পান। সেই চাঁদের ডিঙা—সাম্পানও সেখানে আছে। এই কথা সে কিন্তু তার মা, বাবাকেও বলে নি। এ তার নিজের ভিতরে জমানো। যদি মনে হয় কোনোদিন, বলবে। তবে তার বাবা হয়তো জেনে যাবে । বাবা পারে। বাবা যে অমন। না হলে মাঝ রাতে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে ? আর তারাও কিনা কথা বলে? তাদের সে জানে আর তার বাবা অনিমেষ জানে। অভিও জানবে। আসলে জানলে যে রাতে ঘুমোবে না। সে তার মতো দুইজনার খিলখিল হাসি আর খেলার শব্দ শুনতে চাইবে। আর তারা, মানে পুতুলগুলো আর ঝিলমিল ধিতাং যদি টের পায় তিতলি বাদে আর কেউ আছে জেগে, তারা চুপ করে যাবে। অভিকে তো চেনে নি তারা দুইজন। জানে তারা তিতলিকে।

শাশুড়িমা জিজ্ঞেস করেন, ও তিতলি, এখন শুধু ভাল কথা ভাববি।

হ্যাঁ মা, জানি তা।

তুই যেমন ভাববি তারা তেমন ভাববে ?

তিতলি হাসে নিজের মনে, সে যেমন ভাববে তারা তেমন ভাববে। সে কেমন ভাববে? ভাবনা কি নিজের ইচ্ছেয় হয়। চারদিক নিয়ে ভাবনা হয়। এই যেমন তারা চলে যাবে আন্দামান ছেড়ে, সে কি যেতে চায় সমুদ্র ছেড়ে, এই ব্যালকনি ছেড়ে। এই ফ্ল্যাট ছেড়ে? এ যে তার প্রথম গড়ে তোলা সংসার। ঘর-গেরস্তি। সব ভেঙে দিয়ে চলে যাবে ? সেই ছেলেবেলায় খেলনাপাতির সংসার যেমন এক লহমায় ভেঙে দিত তারা, তেমনি তেমনি। তিনবন্ধু মিলে খেলনার সংসার পাতিয়ে হঠাৎ করে ঝগড়াঝাঁটি, একজন হাত দিয়ে ভেঙে দিল সব। সেই রকম প্রায়। কথাটা মনে হতেই তিতলির মন খারাপ, গোপনে চোখে জল। তার যে বন্ধুরা এখেনে আছে, মনোরমা, চম্পা, রুমকি, শাওনি, তাদের সঙ্গে কিটি পার্টি,

পিকনিক, হৈ হৈ আড্ডা। তারা এখনো জানে না যে অভিরূপ আর তিতলি ছেড়ে চলে যাবে আন্দামান। আগামী কাল শনিবার, তারা কেউ কেউ আসবে। তিতলির নতুন খবর তারা পেয়েছে টেলিফোনে। আজ বিকেলেই আসবে রীথা--রীতা। সে তামিল, কিন্তু কী সুন্দর বাংলা শিখে গেছে। তার দুটি মেয়ে। তাদের নাম সোনালি আর রূপালি। এই নাম দিয়েছে হ্যাভলকের এক খুলনাইয়া। ওরা আগে থাকত হ্যাভলক। এখন থাকে পোর্ট ব্লেয়ার বড়বাজারের কাছে । ওর হাজব্যান্ডের ব্যবসা। হ্যাভলকের ব্যবসা আছে, আবার নীল আইল্যান্ডেও রিসোর্ট খুলেছে। ওর সঙ্গে তার আলাপ বড়বাজারে ওদের কিওরিও শপে গিয়ে কেনাকাটার সময়। আলাপ থেকে বন্ধুতা। রীথা তার থেকে বছর তিনের বড়, সে তিতলিকে খুব ভালবাসে। বলেছে তারা সবাই মিলে তিতলিকে নিয়ে এই ফ্ল্যাটে গান আর নাচের আসর বসাবে। কিন্তু তা তো শ্বশুর শাশুড়ি থাকলে হবে না, তারা চলে গেলে হবে। তিতলির মন খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ। শাশুড়ি মা উঠে গেছেন গড়িয়ে নিতে। তিতলি মোবাইলে রীথাকে ধরল। হেলো রীথা, আয়াম তিতলি, তিতলি বলছি।

রীথা বলল, হাই তিতলি, হাউ আর ইউ সুইতি, আমি আজ যাবে তো।

নো, রীথা, আমাদের ডকটরস অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, আমি ওই জন্যই ফোন করলাম তোমাকে, ডোন'ট মাইন্ড।

ইসস, তুমি কি বলছ মাই ডিয়ার, আমি যে কাল ভোরে হ্যাভলক যাব, উইদ মায় তামিল ফ্রেন্দস, অয়েন দু ইউ কাম ব্যাক?

আই কান্ট সে রীথা, ডক্টর উইল এগজামিন মি।

ওকে, আমি ফিরে এসে যাবে তিতলি, মাই সুইৎ ফ্রেন্দ।

ফোন রেখে দিল তিতলি। তার খুব অভিমান হচ্ছে। এই সমুদ্র, দ্বীপের পর দ্বীপ, সমুদ্রে ভাসা চাঁদের সাম্পান-----সব ছেড়ে চলে যেতে হবে। তার সাজানো সংসার আর তার বন্ধুর দল, মাসের কিটি পার্টি, সব ফেলে দিয়ে কলকাতা আবার। কলকাতায় যদি ফিরবে তো এল কেন এই দ্বীপে?

ফোন এল চম্পার, হাই, তিতলি, কেমন লাগতেসে?

চম্পাদের বাবা-ঠাকুরদা এসেছিল সেই খুলনা জেলার বাগেরহাট থেকে। এখন বাগেরহাট আলাদা জেলা। চম্পা এখানে সিভিল সার্ভিস করে আন্দামান প্রশাসনে। তারা এখনো বাগেরহাটের লোকই রয়ে গেছে। মুখের ভাষা তিনপুরুষেও ভোলেনি। চম্পার হাজব্যান্ড কিন্তু পশ্চিমবঙ্গীয়। কিন্তু স্ত্রী সান্নিধ্যে সে ও পূব্বঙ্গের ভাষায় রপ্ত হয়েছে। কী সুন্দর কথা বলে তারা পরস্পরে। তিতলির ঠাকুরদাও পূববঙ্গ থেকে এসেছিলেন। তাদের বাড়ি ছিল খুলনা জেলার সাতক্ষীরার কাছে । তাদের সেই মুখের ভাষা আর নেই। বাবা বলেন, কপোতাক্ষর কুলে ছিল তাঁদের গ্রাম। তার জেঠা বলেন, দশ বছর বয়সে সাঁতরে

মাঝনদীর নাওয়ে গিয়ে উঠত। নাও, চাঁদের সাম্পান। এই দুইজন কি কপোতাক্ষ পাড়ি দিয়ে এই সাগরে এল? তিতলি বলল, কেমন আছ চম্পাদি?

ভালরে ভাল, তোর জন্যি আচার বানাই নি যাব তিতলি, পাকা তেঁতুলির।

তিতলি বলল, এন গো।

চালতার অম্বল রেঁদে নি যাব রে খুকি। চম্পা বলল।

তিতলি বলল, এই খুকি বল না তো।

খুকি ছাড়া তুই কী, আমার ঠাম্মা আমি পুয়াতি হলি এটটা গান শুনাত, তোরে গিয়ে শুনাব আমি।

ইস, কী যে বল না চম্পাদি।

আমার ঠাম্মা বেঁচে থাকলে তোরে ঘিরে আমরা সবাই গান শুনাতাম তিতলি খুকি, গুনগুন করে ওঠে চম্পা।

আমার সুনার চান্দ পঙ্খী
আমি তোরে ডাকি মন রে,
আরো গুমাবি নাকি শুনারে।
ও আমার সুনার চান্দ পঙ্খী......।

তিতলি বলল, আহা, মোটেই না।

কী মোটেই না? চম্পা জিজ্ঞেস করে।

কারোর যেন আর হয় নি?

কেন হবে না, কিন্তু যতবার হবে, যতবার যে মা হতি যাবে, ততবার সে গান শোনবে, সেই গান আসলে পেটেরটারে শুনাতি হয়।

তাই? শিহরিত হলো তিতলি।

হ্যাঁরে হ্যাঁ, গান শুনতি শুনতি সে গুমায়, এখন তো শুদু দোল খায়, গানের সুরও দোল দেয়, ও আমার সুনার চান্দ পঙ্খী।

চম্পাদি, আমার যে দু'জন। তিতলি বলল।

কী কস ?

দুইজন গো দুইজন, টুইন বেবি আসছে।

চম্পা বলে ওঠে, কী বলিস, জুড়া এয়েচে, জোঙ্কা, যমজ ?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

ও, মা মা মা, আমার কী হবে, তুই দেখি আমাদ্দের সেই গাঁ মালতীপুরের মালোপাড়ার বউ, আমাদের আর একজনরে খবর দি, জোঙ্কা শুনলে ছুটে আসবে তোরে দেখতি। বলে হাসতে লাগল চম্পা। হাসতে হাসতে যেন লুটিয়ে পড়তে লাগল, লুটিয়ে পড়ে

যেন ডাকতে লাগল তার যমজ চামেলীকে, ও দিদি দিদি, একমিনিটের দিদি, এই শোন যমজের খবর, সেই যে তিতলির কথা বলি তোরে...।

৬

চম্পা খিলখিল করে হাসতে লাগল। হাসি নয় যেন গাঙের ঢেউ। কে বলে এই চম্পা বিশ্বাস দাপুটে ম্যাজিস্ট্রেট। বিচার করে। আদেশ করে। সে বলতে লাগল তাদের পূবপুরুষের গ্রাম মালতীপুরের মালো পাড়ার কথা। তারা ছিল পৌন্ড্র ক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র। চাষা। আর মালোরা নাও বাইতো। সব তার ঠাকমা বুড়ির কাছে শোনা। তাদের ঘরে জন্মাত জোড়া সন্তান। কেন, না নাওয়ের দুই দিকে দুইজনায় বসবে বলে। আরে মালো ঘরের মেয়েরা জাল বুনত, বুড়োরাও তাই। কিন্তু মেয়েরা নাও চালাতেও জানত।

সত্যি বলছ চম্পাদি? অবাক হয়ে গেল তিতলি চম্পার কথা শুনে।

মিথ্যে বলে আমার লাভ, তবে বলে গেছে তো ঠাকমা, ঠাকমা কেন মিথ্যে বলবেরে ?

ইস, সেই পাড়ায় সব যমজ !

সব কেন হবেরে, সব ঘরে একটা জোড়া করে থাকবেই, চম্পা চামিলী, অরুণ বরুণ।

তোমার এক বোনের নাম কি চামেলী ?

কে বলল তোরে ? চম্পা জিজ্ঞেস করল।

তিতলি বলল, মনে হল তাই বললাম।

হ্যাঁরে যমজ।

চামেলীদি কোথায়, দিগলিপুরে? জিজ্ঞেস করে তিতলি।

না, সে আছে রঙ্গত, বিয়ে হয়েছে ওখানে।

রঙ্গত এক দ্বীপ। সেখানে চাষাঘরের বউ চামেলী। তাদের চারবিঘের উপর সুপুরি বাগান। আছে নারকেল বাগানও। আবার তার স্বামী একটা হোটেল করেছে রঙ্গতে। ট্যুরিস্টে তা সারাবছর র্ভতি থাকে। চম্পা চামেলী যমজ বটে কিন্তু একরকম দেখতে নয়। চামেলী গৌরর্বণা। চম্পার মাজা মাজা রং। চম্পা র্শীণকায়া। চামেলী পৃথুলা। অথচ তারা যমজ। কেউ বিশ্বাস করবে না। কোনো মিল নেই, তবু তাদের জন্ম পর পর। মায়ের পেটে একসঙ্গে জন্মেছিল যেন সৃষ্টির সেই আদিতে। একে অন্যের প্রতিবিম্ব হয়ে জন্মাবে, তেমনই তো কথা ছিল। কিন্তু তা হয় নি। কেন হল এমন? সৃষ্টি র্কতা জানেন। কিন্তু এমন হয়েছিল। আর তা এই দেশে আসার কত পরে। তাদের জন্ম ১৯৮১। তার ঠাকুরদা তার ঠাকুমা আর ছোট তিন পিসিকে নিয়ে পার হয়েছিল দেশভাগের চার বছর বাদে। তখন তার বাবা ঠাকুমার পেটে। বাবার জন্ম চাঁদপাড়ায়, রেললাইনের ধারে। তারপর রাণাঘাট কুর্পাস ক্যাম্প হয়ে আন্দামান, জাহাজে চেপে।   চম্পার তিন পিসির দুই পিসি একরাতেই কলেরায় মারা গিয়েছিল চাঁদপাড়ায়। সে অনেক দুঃখের কথা। সেই দুঃখ ঘুচেছিল যমজ

নাতনিতে। পরে ঠাকুমার আরো দুটি সন্তান হয়। কিন্তু ছেলে। যমজ নাতনি যেন তাঁর অকাল মৃত দুই কন্যার শোক ভুলিয়েছিল। বুড়ি তাই বলত। বলত ,মালোপাড়া তো দ্যাশে রইসে, তার হাওয়া না ইটি, ই তারা, উমনো ঝুমনো---- পিঠোপিঠি দুই বুন, দুই মেয়ে চম্পা চামেলী। হতেই পারে তা। ঠাকুমা দুই দুই নাতনির মুখের দিকে চেয়ে থাকত, এই দ্যাখো বউমা, তারা অমনই তাকাইতো, অমন হাসকুট্টি ছেল, অমনই ছেল, অমনই।

হ্যাঁ, তাদের পরিবারে কোনো যমজ সন্তানের ইতিহাস ছিল না। তারাই প্রথম। মালোপাড়ার হাওয়া লেগেছিল তাদের গায়ে। অথচ সেই মালো পাড়া তখন কোথায়? মালোরা তো আসেই নি এপারে। দেশ তারা ছাড়ে নি। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেদের গ্রাম আর নদী, সেই ভৈরব রূপসা আর সেই মালোপাড়া নিয়ে থেকে গেছে তারা। তারপর পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধে মরেছে কত যমজের এক একজন করে, অন্যজন মুক্তি হয়ে যুদ্ধ করেছে। দাঙ্গাও মরেছে, তবু তাঁরা দেশ ছাড়ে নি।

পাকিস্তান হিন্দুস্তান জানি নে, কেনে যাব সাতপুরুষের গাঁ ছেড়ে ? একশো ছোঁয়া দুই বুড়ো মালো নাকি বলেছিল চাষারা যখন ভিটে ছেড়ে ইন্ডিয়ার দিকে রওনা দেয়।

কিন্তু তারপরও কয়েকঘর নাকি এসেছিল। হাবড়া মসলন্দপুরে আশ্রয় নিয়েছিল। সব চম্পার কাছে শুনেছিল তিতলি। চম্পা তার বাবা মায়ের কাছে শুনেছিল। আর সেই কথা সে তিতলিকে শুনিয়েছে কত। তিতলিরে তিতলি, আমার ঠাম্মার কাছে শুনেচি, ঠাম্মার এক ঠাকুদ্দার বাবা বড় ঠাকুর নাকি মালো পাড়ার মেয়ে বিয়ে করেছিল। সেই কুমিল্লার কথা। তিতাস নদীর ধারের মালো পাড়ায়। কিন্তু সেই একবার। আর না। সেই যে মালো পাড়ার রক্ত ঢুকল ঠাম্মার ভিতর দিয়ে আমাদের ভিতর, তা থেকেই বোধ হয় আমাদের জন্ম। কুমিল্লা থেকে ঠাম্মারে নিয়ে এসেছিল আমাদের ঠাকুদ্দা।

তিতলি সেদিন রাতে অভিরূপকে বলল, জান তুমি মালো পাড়ার কথা ?

কোন মালো পাড়া ?

তিতলি বলতে অভিরূপের কী হাসি, বলল, ওই চম্পা মল্লিককে আমার অদ্ভূত লাগে।

কেন, চম্পাদি কী করল ?

কেমন খুলনাইয়া ভাষায় গল্প করে, আবার মালো পাড়ার যমজের গল্প, পারেও বটে।

বাহ, ওরা এত বছরেও ভোলে নি যে।

অভিরূপ বলে, আমাদের যে টুইন এসেছে, এখানে মালো পাড়া কী করে এল ?

আহা তা কেন হবে, চম্পাদি মালোপাড়ার গল্প বলেছে।

তখন অভিরূপ বলল, টুইন তো বায়োলজিকাল কারণেই আসে, ওসব গল্প না শুনলেই নয়, আগের দিনের বুড়িরা এইসব গল্প বানাত।

তিতলি তখন বলেছিল, আমাদের কাছে দুই নাইয়া আসছে গো।

নাইয়া কী ? অভিরূপ অবাক।

যারা নাও বায়।

তার মানে নৌকোর মাঝি? অভিরূপ বলে।

হ্যাঁ বলতে পারো।

ইসস, তা হবে কেন?

তাহলে কী হবে গো? তিতলিএই যে অভিরূপের গলা জড়িয়ে ধরেছিল।

তোমার ভিতরে মালোপাড়ার গল্প ঢুকেছে। অভিরূপ বলেছে।

আহা, তা কেন হবে, মালোপাড়া ছাড়া কি টুইন হয় না?

তুমি মালোপাড়ার গল্প কবে শুনেছ ? অভিরূপ জিজ্ঞেস করেছিল।

সেই কবে, আমার মনেই নেই, চম্পাদি তার বোন চামেলীদিকে নিয়ে এসেছিল আমাদের এখানে, সেদিন বোধ হয়।

কবে তা। ?

বছরখানেক আগে হবে হয় তো।

গল্পটা তোমার মাথায় ঢুকে গিয়েছিল মনে হয়। অভিরূপ বলেছিল।

তিতলি চুপ। তাই কি? সেই যে সেই ঝড়জলের রাতে আচমকা বৃষ্টি থেমে যেতে চাঁদের সাম্পান বেয়ে ঘরে এল দুইজন, কোথা থেকে এসেছিল গো ? নিজেকে জিজ্ঞেস করে তিতলি। সেই কি মনের ভিতরে সেই মালো পাড়া ধরে রেখেছিল ? অদেখা সেই ভিনদেশের মালোপাড়া। তার পিতৃভূমি বাংলাদেশ। মায়ের দেশ বর্ধমান। তার নিজের দেশ এই ভারত। কলকাতা আন্দামান দিল্লি মুম্বই ছত্তিশগড়......গোটা ভারতবর্ষ। তার জন্ম কলকাতায়। একটা ফ্ল্যাটে। তার জেলা নেই, নদী নেই, গ্রাম নেই। আছে বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা। বে অফ বেঙ্গল। তিতলি ভাবল বলে দেয় সব। কিন্তু তার গলা বুঁজে যায়। অভিরূপ বিশ্বাস করবে না। অভিরূপ হা হা করে হাসবে। বলবে এর জন্য দায়ী চম্পা মল্লিক, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। চাঁদের সাম্পান বেয়ে কি তারা সেই বাংলাদেশের মালোপাড়া থেকে এল ? মালোপাড়ার যমজ তাদের ভিতরে আসবে কী করে? অভিরূপদের ফুলবনিতে নৌকো বাওয়ার মতো নদীই নেই। আছে ঝোরা, ঝর্না আর একটি নদীর মতো ক্ষীণ জলধারা। সেই নদীর নাম চিন্তানদী। চিন্তামনি। কী রকম একটা নাম। রুখু দেশ। উনি জল দেন তাই চিন্তামনি। কিন্তু মোটেই ভাল নাম নয় সেই নদীর। আর সেখানে নৌকো চালনার মতো জল নেই। তো মালো। নাইয়া।

তিতলি বলল, ঘুমোই।

আমার ঘুম আসছে না। অভিরূপ বলল।

কেন ঘুম আসছে না কেন ?

অভিরূপ বলে, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

তিতলি যেন সুখে গলে গেল, বলল, আমার সুখ হচ্ছে খুব, দুজন যে কী করবে গো, আমি দুজনকে কী করে সামলাব গো।

অভিরূপ বলল, কেন গান শুনিয়ে ঠান্ডা করবে, হবে না ?

তারা কথা বলছিল এমনি করে। তিতলির ভিতরে একটা উদ্বেগও কাজ করছিল। এই সময় তারা যদি হুটোপুটি শুরু করে দেয়। খেলতে আরম্ভ করে, তখন ! শিম্পাঞ্জি, বানর খরগোস ম্যাকাও পাখি আর কুকুর এঘর ওঘর করতে থাকে তাদের সঙ্গে, তখন কী হবে? ওই যেন খুট করে শব্দ হল। শিম্পাঞ্জি উঠে বসল আলমারির মাথায়। দোলনায় উঠল কেউ। ছোট ছোট পায়ের শব্দ শোনা যায়। ইস,এইবার টের পেয়ে যাবে অভি। অভি আচমকা চুপ করে গেছে। শুনতে পেল নাকি। তিতলির গায়ে কাঁটা দিল, মনে হল নীল অন্ধকারে কে যেন বলল, চুউপ, জেগে আছে লোকটা।

লোকটা কে রে? একজন বলে।

অভি। অন্যজন উত্তর দেয়।

অভি কে রে?

লোকটা।

আহা লোকটা ?

অভিইইইইইই। কথা চালাচালি করে দুইজন এই রকমে। এই কথা সেই কথা। লাল বল আর নীল বল।.........অভি ঘুমোল?.........জেগে আছে.........এই তিতলি ঘুম পাড়া।

অভি ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।

এই তিতলি ঘুম পাড়া।

আয় ঘুম যায় ঘুম মালোপাড়া দিয়ে
মালোদের সোনা ঘুমায় জাল মুড়ি দিয়ে।
একটি নয় দুইটি সোনা, দুইটি জালে মুড়ি।
একটি মায়ের স্বপ্নে এল, বলছে মালো বুড়ি।

অভি কি শুনতে পেল ? অভি তার গলা জড়িয়ে আছে। এই এই, ঘুমোলে? এই অভি অভি। অভির সাড় নেই। এই যে বলল, তার ঘুম আসছে না। আচমকা ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? তার তো ভয় করছিল খুব। এখন যদি খেলা আরম্ভ হয়, অভি যে জেনে যাবে মালোপাড়ার দুই মালোর কথা। আগে মনে হয় নি, আজ মনে হল। সেই ভৈরব না রূপসা পেরিয়ে মেঘনা পদ্মা তিতাস পার করে অকুল গাঙে ভেসে বঙ্গোপসাগরে এসে পড়ল। মালোরা তো এমনিই ভাসে। দুইজনায় নাও বাইতে বাইতে হাতিয়া, জাহাজমারা ঘাট, সন্দীপ, নিঝুম দ্বীপ, ভোলা, উড়ির চর সব পার হয়ে হয়ে নোয়াখালি কুমিল্লা চাটগাঁ থুয়ে রেখে মা খুঁজতে খুঁজতে চলে এল তার দুয়ারে।

মা মা মাগো, কত গাঙ পেরুলাম মা, কত বাতাসে পাল উড়ালাম মা। আমরা মালোপাড়া থেকে আলাম মা তিতলি। বাতাস আমাদের ভাসাই নিয়ে এল। মালোপাড়ার বুড়ো, যার বয়েস একশো—দুশো হবে, তিনশো হবে, মুক্তিযুদ্ধর আগে তারা ছিল দুইজন, জোড়া মানুষ, মুক্তিযুদ্ধে একজন মরতে সে একা, সেও মুক্তিযুদ্ধ করেছিল, সে বলল, যাহ, ভেসি যা। মার কাছে যাহ। তাই আমরা ভাসলাম। গাঙের ধারে তখন মস্ত বুড়ো একা। তার চুল দাড়ি সব যেন জন্ম থেকে শাদা। সে যেন ত্রিকালর্দশী হয়েই জন্মেছিল আর একজনের সঙ্গে। কেউ বলে, মুক্তিযুদ্ধ না, আর একজন গাঙে গিয়ে ফেরে নি, একা গিয়েছিল গাঙের ভিতর থেকে ডাক শুনে। গাঙ অমনি ডাকে মাঝনিশীথে। একা বেরতে নেই। গহীন রাত ডেকে নেয়। আকাশে সুতোর মত চাঁদ। সবদিক নিঃঝুম। শুধু নোনা জলের গাঙ বয়ে যায় নিজ মনে। বুড়ো মালো বলল, ভেসে থাকবি ওই জলে, ওই জল মাতৃজল। ওই জলে আমি আর আমার বুন ভেসেছিলাম। আমার বাপেরা দুই ভাই ভেসেছিল। জগতের যত মানুষ সব ভেসেছিল। যা, অকুল গাঙে যা। গহীন রাতে মা খুঁজতে বেরুতি হয়, তুরা যা।

কী বলিস তোরা , ও সোনা।

হ্যাঁ, মা, সত্যি সত্যি সত্যি, বুড়ো একা ছিল বটে, কিন্তু গাঙে ভেসে পিছনে তাকায়ে দেখি বুড়োর পিছনে কত ছায়া গো মা তিতলি, অন্ধকারে কতজন, সব হাত নাড়ছে, তখন জলে ঢেউ দিল, দিতিই লাগল, বুড়ো বলেছিল ঢেউ দিয়া মানে মা জেগে আছে, গাঙ নিয়ে মা যাচ্ছে হেথা থেকে হোথায়।

কী বলিস তোরা যে, আমার কান্না আসে।

ভাল আছ মা তিতলি ? তখন তাদের একজন বলল।

তিতলি কাঁদতে লাগল অন্ধকারে। আহা, বল তোরা, মালোবুড়ো ভাল আছে ?

আছে গো আছে, সেই তো এমন মা দিল আমাদের, বলল, যা যা যা, ভেসে যা মাতৃজলে যা, গাঙের জল সেই জল, গাঙ তাই মা জননীর কাছে যাবার পথ।

মালোপাড়া ভাল আছে? মনে মনে জিজ্ঞেস করে তিতলি।

আছে আছে, মালোরা খুব ভাল আছে গাঙ আর গাঁ-দেশ নিয়ে, না এসে তারা ভাল করেছিল, এপারে গাঙ না পেয়ে হাবড়া মসলন্দপুর থেকে ফিরে গিয়েছিল বুড়ো মালোর বেটারা। গাঙ ছাড়া বাঁচে কী করে, তারপর তারা বুড়ো হল, মালোবুড়ো হল, তাদের কতজন যৈবনকালে মুক্তি হল, খান সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করল, মরল, বাঁচল, সে কত কথা। শোনো, গাঙ ছাড়া মানুষের জন্ম হয় না? মানুষ তো নোনাগাঙেই ভেসে ভেসে মানুষ হয়, নোনা গাঙেই মা খুঁজতে বেরোয়।

আয় সোনারা আয়।

কোল দাও মা কোল দাও, দাঁড় টেনে টেনে হাল ধরে ধরে বড় হাঁপ লেগি গেছে গো।

তুমার কোলে ঘুমাই মা। একজন বলে।

ঘুম দাও মা, দোল দিয়ে দিয়ে ঘুম দাও। আর একজন বলে, তুমি এঘর ওঘর কর, জলে দোল হোক, আমরা ঘুমাই।

তিতলি একা একা অন্ধকারে নিঃশব্দে কাঁদছিল। আনন্দাশ্রু। কতদিন সে মনে মনে চেয়েছে খেলনাপাতিগুলো নিয়ে খেলবে কে? আয় তোরা। নে সব। খেলা কর। খেলতে থাক। খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়। আয় সোনারা আয়। তিতলির দু'চোখ দিয়ে করুণার অশ্রু, স্নেহ আর মায়ার অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল।

৭

চম্পা এল। সঙ্গে সেই চামেলী। চামেলী এসেছিল পোরটব্লেয়ার, তাকে নিয়ে এসেছে চম্পা। চামেলীর সঙ্গে কোনো মিল নেই চম্পার। কিন্তু যমজ। এক মিনিট বাদে বাদে জন্ম। চম্পা ছিল উপরে, নিচে ছিল চামেলী। চামেলী আগে এল আলোয়। তাই সে দিদি। চম্পা তাকে দিদিই বলে। চামেলী চাষী ঘরের বউ। সুপুরি বাগান, ধানজমি, পুকুর, গোয়াল গরু নিয়ে সম্পন্ন গেরস্ত ঘরের বউ। রান্নার হাত ভাল। চুনোমাছের চচ্চড়ি যা রাঁধে! আর চালতার কিংবা কয়েতবেলের অম্বল। পরেছে সিল্কের শাড়ি। তার হাতের বটুয়ার ভিতর পানের কৌটো। কচরমচর পান খায় খুব। গিন্নিবান্নি চেহারা। তার এক ছেলে দুই মেয়ে। পিঠোপিঠি সব। বলল, দুইটা তো, ভাল, একবারে দুইটা, কী ভাগ্যবতী তুই তিতলি।

বলবে কী, তিতলি কিছু বলতে পারে না, তার শাশুড়িও না। শাশুড়ি মাধবী অবাক হয়ে দেখছেন যমজ দুই বোনকে। একেবারে আলাদা। শুধু একটা মিল আছে মনে হয়। কী না, দুজনই একই রকম হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলে। আর দুজনের একই রকম হাসি। যে হাসি লেগে থাকে মুখে, তা একরকম। তা ভাল। দুজনে দুরকম হওয়াই ভাল। না হলে মা ছাড়া অন্যদের চিনতে সময় লাগে। ভ্রান্তি বিলাস হয়ে যায়। হ্যাঁরে ,তিতলি ভ্রান্তিবিলাস দেখেছিস? তিতলি বলে, খুব ছোটবেলায় মা, উত্তম আর ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তো?

উফ, কী হাসির গো মাসি, আমাদের কাছে সিডি আছে।

কোথায় ?

বাড়িতে, রঙ্গতে।

তখন চম্পা বলল, আমি খোঁজ করব মার্কেটে, যদি পাই দিয়ে যাবরে তোকে।

চামেলী বলল, তুই কী জোড় লাগা কলা খেয়েছিলি ষষ্টীর দিনে, জোস্কা?

তার মানে ? তিতলি অবাক।

ঠাম্মা তাই বলত না ? চামেলী জিজ্ঞেস করে চম্পাকে।

চম্পা বলে, ওসব কি কেউ মানে, না এসবের কোনো সত্যতা আছে ?

মানে না সে অন্য কথা, কিন্তু কথা কি সত্যি নয়, জুড়া কলা মেয়েদের খেতি কেন বারণ করে, ওই জন্যি, এইটা কি মিথ্যে ?

ধুর তাই যদি সত্যি হয় তবে তো ইচ্ছে করলেই টুইন হত, তোর কেন হল না রে দিদি, তুই না বলতিস তোর জোড়া হবে, তুই তো আরো বাচ্চা চাই বলিস।

চামেলী বলল, ইচ্ছে করলে হবে কেন, অজান্তে খেতে হবে, তারপর মনে পড়বে।

হেসে ফেলেছে তিতলি, বলল, ওটাও কলাগাছ-মার টুইন বেবি, কলা বউ-এর টুইন।

ভাল বলেছিস তুই। চামেলী তার গায়ে হাত রাখল। পিঠে ভালবাসার হাত বুলোতে লাগল। বলল, আমাদের বাগেরহাটের মালোপাড়ার কথা তো শুনেছিস, ওদের ঘরের বউরা, স্বামীরা জোড়া খেত না কিছুই, কিন্তু হয়ে যেত।

ওরা কী খেত? জিজ্ঞেস করেন তিতলির শাশুড়ি মাধবী।

শোল মাছ আর পাতাড়ে মাছ। চামেলী বলে, শোল মাছ দিয়ো মাসি তোমার বউমাকে। জোড়া শোল দিয়ো, আলু দিয়ে মাখো মাখো করে।

ইস, আমি শোলমাছ খাই না। তিতলি বলে।

কেন খাসনে, শোলমাছে রক্ত হয়।

এমনি, কেমন যেন লাগে মাছটাকে। তিতলি বলে।

কী এক রসিকতা করতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল রঙ্গত দ্বীপের চাষী ঘরের বউ। তিতলির শাশুড়ি মাধবী বসে আছেন যে। সে বলল, যমজ মানেই আমাদের বাগেরহাটে বুঝত মালোপাড়া, তারা তো ক্যাওট—কৈবত্ত, মাছের অভাব ছেল না মাসি।

মাধবী অবাক হয়ে চামেলীর কথা শুনছিলেন। চামেলী যা বলছে তা তাঁর বোধগম্য হয় না। মালোপাড়া কোথায় ? সেই বাগেরহাট ? মানে বাঙলাদেশ! ওরা ওদেশের ছিল তা জানেন তিনি। কিন্তু সে কবেকার কথা। তাঁর নিজের জন্মের অনেক আগে দেশ স্বাধীন আর ভাগ হয়েছে। মাধবীকে তখন মালোপাড়ার যমজ সন্তানদের কথা শুনতে হয়। মাধবী অবাক। কী আশ্চয ! সব ঘরে যমজ ? কী খেয়ে সব পোয়াতি হত যে জোড়ায় জোড়ায় পেটে ধরত ? পুরুষগুলো কী বীজ দিত যে যমজ হতো ? সত্যি না বানানো কাহিনি ? সত্যি মাসি, আমার ঠাম্মা বলত গো। ঠাকুদ্দাও বলত। সেই মালোপাড়ায় জোড়া খেজুরগাছ ছিল কয়েকগন্ডা। এক কান্ড থেকে দুটো বেরিয়েছে। কলার কাঁদিতে জোড় লাগা জোঙ্কা কলা থাকতই থাকত দু চারটে। সে হল যমজের গাঁ। আসলে নাও বায় তো তারা। হাল ধরা আর দাঁড় টানার জন্য দু'জন লাগে। কত দূরসমুদ্দুরে পাড়ি দেয় ইলিশের জন্যি, মাছমারার জন্যি। একা কি হয়, দুই ভাই গাঙে পাড়ি দিতে হয় তাই ঘরে ঘরে যমজ, তারা খেটে খায়, যমজ তাদের আশীর্বাদ। নতুন বউ ঘরে এলেই জোড়া ষষ্টীর পুজো দিত। জোড়া কলা খেতে দিত ফুলশয্যের আগে। তারা জেনে যেত যমজ আসবে পেটে।

মেয়ে ছিল না যমজ ?

কেনে থাকবে না।

তারাও কি নৌকোয় হাল ধরত ?

না, সংসারের হাল ধরত, সে সংসারের কত কাজ, ধান কাটা, ধান ভানা, জাঁতা ঘুরানো, গোয়ালকাড়া, জাবনা কাটা, দুধ দোয়া, ঘরবাড়ি নিকোন, বাচ্চা বড় করা, সব দশভুজা, কিন্তু মালোপাড়ার মেয়েরাও নাও বাইতে জানত গো, একবার বলে দুই বুন, অভাবের সংসার বাপ-মার, বাপ কাকা গেছে ইলিশির নাও নিয়ে, ফেরে না, ফেরে না, সব নাও ফিরল কিন্তু হেতাল বেতাল দুই যমজ ভাই-এর নাও ফিরল না, মাছ মেরে মাছ বেচে সওদা আনার কথা ছিল যে, তখন দুই বুন তারা, ক্ষারে কাচা লালপেড়ে শাড়ি পরে, চুল বেঁধে আয়নায় মুখ দেখে, চোখে কাজল দিয়ে গাঙের ধারে গেল, নাও ভাসাল তারা, দুজন নাও নিয়ে চলি গিছিল কুথায় তাদের বাপ-কাকাদের খুঁজতি।

তাই ! খুব সাহস তো, খুঁজে নিয়ে এল ? মাধবী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন।

না, তারা আর ফিরেনি মাসি। চামেলী বিষণ্ণ গলায় বলে, ফিরেনি সেই ইলি বিলি দুই বুন, গাঙ তাদের ভাসাই নি গেল।

ইলি বিলি দুই বুন, গাঙে ভাসিয়া যায়।
ইলি বিলি সোনারা গো আয় ফিরিয়া আয়।

এই দিদি এইসব গাল-গপ্পো রাখত। চম্পা বারণ করল মৃদু স্বরে, সারাদিন বসে বসে বুড়িঠাম্মা সব বানাত, সে বুড়ি পা মেলায়ে বসে শুধু গল্প আর গল্প, মালোবুড়োর গল্প।

নারে বুন, মিথ্যে না, সবাই জানে মালোপাড়া কেন গাঙের ধারে ধারে যত গাঁ, সবাই জানে, হেতাল বেতাল দুই ভাইরে খুঁজতি হেতালের যমজ মেয়ে দুটো ভেসি গেল।

তোর মুন্ডু, এসব বানানো কথা, মাসিমা আমাদের মা ঠাম্মারে বলত মালোবুড়ি।

মা মোটেই ঠিক বলত না, এ কথা মালোপাড়ার সবাই জানে।

তখন তিতলি উঠে গেল ঘরের দিকে। তা দেখে চম্পা ডাকল, কোথায় যাস তিতলি ?

তিতলি ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, ঘরে বসে সমুদ্র দেখি একটু, কলকাতায় ফিরে যাব, এই ভাবে কি আর দেখা হবে ?

চম্পা বলল, আর কি আসবিনে জোড়া বাচ্চা নিয়ে?

তিতলি বলে, তুমি ঘরে এস চম্পাদি। চামেলীদি তুমিও এস। মা তুমিও এস।

চম্পা ওঠে, কিন্তু চামেলী ওঠে না। চম্পা উঠে গেলে চামেলী চাপা স্বরে মাধবীকে বলে, কথাটা কিন্তু সত্যি।

মাধবী উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, ফিরল না, সত্যি ফিরল না ?

না মাসি ফিরল না, কত গাঙ, কত ঘাট, কত গাঁ, কুথায় খুঁজে পাবে তারা হেতাল বেতালকে, ইলি বিলি গাঙে গাঙে ডাক ছাড়ে হেতাল বেতাল বাপ-কা গো, গাঙের বাতাস তাদের কথা খেয়ে নেয়।

তারপর কী হলরে?

কী হবে, হেতাল বেতাল ফিরে এল, তাদের নাও হর্মাদে লুট করেছিল, কোন সাগরে টেনি নি গিছিল, কোন দ্বীপে আটক করে রেখেছিল নাকি, অনেক কষ্টে ছাড়া পেয়ে সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরুয়ে ফিরিছিল।

তারপর কী হল?

চামেলী বলল, হর্মাদরা ছিল ভিনদিশি, পর্তুগীজ হবে, ঠাম্মা বলত খুব লম্বা, ফর্শা, এইয়া জুয়ান, দেখলি বুকি ভয় ধরি যাবে, খুব নিষ্ঠুর, কী ভাষায় কথা বলে বুঝা যায় নি, সে ওদের ভাষাই হবে, হাঁ, মাসি আর একটা কথাও শুনা যায়।

কী কথা?

তারা নাকি কাছিমের পিঠে চেপে ফিরেছিল।

কারা সেই দস্যুরা?

না, হেতাল বেতাল দুই ভাই।

ধুত তা হয় নাকি? মাধবী বলেন, গাঁয়ের লোক এমন গাল গপ্পো বানায়।

না সত্যি, আমাদের বাগেরহাটের মালোপাড়ার সেই জোড়া জোড়া মানুষ মুক্তি যুদ্ধ করেছিল, তা জান? চামেলী বলে।

হতে পারে।

মুক্তিপাড়াও বলে তাই মালোপাড়াকে, জান?

কী করে জানব?

চামেলী বলে, একবুড়ো যায় গাঙে ভেসে, আর এক বুড়ো মালোবুড়ো হয়, তার কথাতে সব হয়, যমজ হয়, জান গো শুনিচি সেখেনে জুড়া পুন্নিমেও হয়।

তার মানে ? মাধবী অবাক।

মালোবুড়ো চায় তো একমাসে দুটো পুন্নিমে, শুনা যায় মুক্তি যুদ্ধে পাঁচ পাকিস্তানিকে গাঙের জলে ডুবাইছিল মালো জুয়ান, আর করবি খানসেনা গিরি, এখন সে বুড়ো। বলতে বলতে চামেলী তার বটুয়া থেকে পানের কৌটো বের করে একটা পান বাড়িয়ে ধরে মাধবীর দিকে। মাধবী পান মুখে নিতে নিতে শোনেন, আমাদের বরজের পান মাসি, পান সুপুরি কিছুই কিনতি হয় না, খয়ের গাছও লাগাইছিলাম, কিন্তু বাঁচে নি, ওইটা আর চুন কিনি, শাকশব্জি সব চাষে হয়।

বাহ, তোমাদের কোনোদিন অভাব হবে না চামেলী।

না, অভাব নেই মাসি। পান চিবোতে চিবোতে চামেলী বলে, কথাটা কিন্তু সত্যি।

কী সত্যি ? মাধবী জিজ্ঞেস করেন, বরজের পান ?

হি হি করে হাসে চামেলী, বলে, না মাসি, মুক্তি যুদ্ধের কথা, মালোদের কথা আর ওই যে কচ্ছমের পিঠি চেপে ফেরা, গাঙে বড় বড় কচ্ছম হয়, তাদের কাছিম বলে, তারা সাত সমুদ্দুর পাড়ি দেয় তা জানো?

মাধবী বলেন, শুনেছি, ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে একবার দেখাল মনে হয়, পর্তুগাল, স্পেনের প্যাসিফিক ওসান থেকে তারা ডিম পাড়তে বে-অফ-বেঙ্গলে আসে সাঁতরে।

তখন চম্পা বেরিয়ে এসে ডাকে, বলে, দিদি মাসি ওই ঘরে এস।

কেন ? চামেলী জিজ্ঞেস করে।

খুব মন খারাপ করছে তিতলি।

ওমা কেন গো? চামেলী উঠল।

মাধবী বললেন, কী হয়েছেরে তিতলি, মন খারাপ কেন।

তিতলির ঘরে ঢুকেছে সবাই। তিতলি দাঁড়িয়ে আছে জানালায়। জানালার ওপারে সেই দূরে সমুদ্র। এখন শেষবেলায় নীল জল ক্রমশ ধুসরতার দিকে যাত্রা করেছে। মাধবী ডাকলেন, কী হয়েছে রে তিতলি?

তিতলি ফিরল, চোখ ছলছল করছে, বলছে, আমি সব সাজালাম মা, আমার সংসার, আমাকে সব ফেলে চলে যেতে হবে।

তাই, তুই কি চিরজীবন এখানে থাকতে এসেছিস তিতলি? চম্পা বলল, মন খারাপ কেন করছিস?

এই সময়ে মন খারাপ করতে নেই। মাধবী বললেন, যদি থাকতে পারতিস থাকতিসরে তিতলি, কিন্তু কেউ থাকবে না, তুই একা থাকবি কী করে, আমরা তো এই ন'মাস এখেনে বসে থাকতে পারব না, তোকে ফেলে যাই কী করে?

তিতলি খাটে এসে বসে, বলে, কলকাতায় তো এমন সমুদ্র থাকবে না মা।

মাধবী হেসে ফেললেন, সমুদ্র দেখে বোর হসনে তুই, আমার তো বিরক্তি লাগে, জল জল আর জল, কিন্তু মুখে দেওয়ার উপায় নেই, ওয়াটার ওয়াটার ওয়াটার, নট আ ড্রপ টু ড্রিঙ্ক।

চামেলী বলে, কিন্তু সাগর আর গাঙ না থাকলি জগত হত না মাসি।

মাধবী বলেন, তোমরা সারাবছর কী করে সমুদ্র নিয়ে থাকো গো?আমার একদম ভাল লাগে না।

এই রকম কথার কোনো উপসংহার হয় না। একজন হ্যাঁ বললে অন্যজন না বলে। একজন সমুদ্র বললে অন্যজন বলে স্থলভূমি। একজন অরণ্য বললে অন্যজন পাহাড়। তিতলি চুপ করে আছে। এখনই অভি ফোন করে বলল, এয়ার টিকিট পাওয়া গেছে, ক'দিন বাদে, ২২শে যাত্রা। আর তা শুনে তিতলির মন ভেঙ্গে গেছে যেন। ইস, এই জানালা সারাজীবনের মতো ছেড়ে যেতে হবে। এই জানালা দিয়েই তো সে তাদের দেখেছিল। থিতাং আর ঝিলমিল তাদের নাম দিয়েছে সে। এই ঘরে তারা খেলে রাতের অন্ধকারে। কেউ জানে না তা। শুধু সে-ই জানে। তার মন জানে।

মাধবী বলল, গোটা জীবন পড়ে আছে, আন্দামান নিয়ে থাকলে হবে, আবার ঘর সাজাবি, এ তো তোর নিজের ঘর না।

চামেলী বলল, বছরে একবার করে এসে ঘুরে যাসরে তিতলি, যেমন নাইয়র হত, এটা যেন তোর বাপের বাড়ি।

আহ দিদি, তুই বড় বেশি কথা বলিস। চম্পা থামাতে চায় তাকে। কিন্তু মাধবীর তো ভাল লেগেছে চামেলীকে। মাধবী বর্ধমানের মেয়ে। মেদিনীপুরের বউ। কলকাতায় তাঁর সংসার। মাধবী নদী আর সমুদ্রের এত কথা শোনেন নি কোনোদিন। আর চামেলী তো বলেও সুন্দর করে। কী বলে, না কাছিমের পিঠে চেপে হেতাল বেতাল দুই ভাইয়ের মালোপাড়ায় ফেরার কাহিনি। সব লুট করে তাদের নাও ডুবিয়ে দিয়েছিল হার্মাদ জলদস্যু। তারা মেঘনার জলে ভেসেই যেত গো। কোথা থেকে দুই কাছিম এসে তাদের তুলে নেয় পিঠে। তারপর এ গাঙ সে গাঙ পেরিয়ে, নুয়াখালি, কুমিল্লা, বরিশাল পার করে বাগেরহাটে এল রূপসার ভিতরে। মাজ রাতি মালোপাড়ার ঘাটে নামায়ে আবার ফিরে গেল গহীন গাঙে। সেই কাছিম আসে সাতসাগর পার হয়ে তের নদী উজিয়ে।

চামেলীর কথা শুনে মাধবী বললেন, ও তিতলি শুনলি কী সুন্দর গল্প।

তিতলি বলল, হ্যাঁ মা, খুব সুন্দর, কার গল্প গো, এমন গল্প তো শুনেছি ডলফিন নিয়ে।

ও ডলফিন হয় যেমন কচ্ছম তার চেয়ে কম না। চামেলী বলে।

আহা, কেমন গো, আবার বল দেখি, সবটা তো শুনিনি। তিতলি বলে।

চামেলী পানের রস বেসিনে ফেলে জলে ধুয়ে দিয়ে ফিরল। বসল তিতলির কাঁধে হাত রেখে, বলল, মন খারাপ করবিনে একদম, মন ভাল রাখবি সব সময়, বুঝলি, কখনো দুঃখের কথা শুনবিনে, ভাল গান শুনবি, ভাল গল্প, দেখবি একজন ঢোল আর একজন কাঁসি বাজাতে লেখেছে তোরে ঘিরে।

আহা, তুমি কী সুন্দর কথা বলো না চামেলীদি!

৮

চামেলী বলে, ওরে শোন, কচ্ছমের গল্প, গল্প না, সত্যি, ও মাসি সত্যি কথা, গহীন গাঙে নাও ডুবি হলে অমনি হয় সুনামীর সময় কত ভেসে যাওয়া মানুষকে ডাঙায় দিয়ে গিছিল কছুয়া দ্বীপের কাছিম, আর সে বছর লঞ্চ ডুবি হল গাঙে, নীল আইল্যান্ডের দুই বুড়ো বেঁচে গেল ওদের দয়ায়, মাসি তারা এখনো বেঁচে আছে, গিলিই দেখা পাবা।

কছুয়া দ্বীপ কোথায়? তিতলির কৌতুহল হয়।

তুমি লঞ্চে আমাদের রঙ্গত যাবা যখন দেখতি পাবা।

আমি তো গিয়েছি রঙ্গত, দেখিনি তো। তিতলি বলে।

কেউ না দেখালি দেখবা কী করে তিতলি, তুমি স্ট্রেট আইল্যান্ডে জারোয়া নামান দেখেছ তো।

হ্যাঁ, মাঝসমুদ্রে থামল লঞ্চ। তিতলি বলে, তবে জারোয়া না, গ্রেট আন্দামানিজ, ওরা আলাদা ট্রাইব।

চামেলী হেসে বলল, সবই জারোয়া, সে তুমি যাই বলো।

চম্পা কোনো কথা বলছে না আর। চামেলী কথায় মন জয় করে নিয়েছে তিতলির গম্ভীর শাশুড়ির। তিতলিও কেমন ঘন হয়ে বসেছে চামেলীর। তিতলির দুঃখ হরণ করতে লেগেছে চামেলী। মন ভাল করার দায় নিয়েছে যেন চামেলী। চামেলী বলছে ইস্ট্রেট আইল্যান্ড পেরুয়ে গেলিই ওপেন সি। খোলা সমুদ্র। আর কোনো দ্বীপ নেই আশেপাশে। জল আর জল। সেখেনে খুব হাওয়া দেয়। ঝাপটা মারে। ঢেউ দেয় খুব। কোনো বাঁধা নেই তো। তখন পশ্চিমে তাকালে দেখা যায়, হুই যে কুয়াশা কুয়াশা, ছায়া ছায়া, কছুয়াদ্বীপ, কচ্ছমের দ্বীপ, আগে কচ্ছম মারতি যেত লোকে, এখন গরমেন্টের নিষেধ আছে, আর মানষির কত উপগারে আসে, তাদের মারবে কেন গো।

ইসস, দেখা হল না। তিতলি বলে, ওপেন সি তো দেখছি সেবার রঙ্গত যেতে গিয়ে,আর কিন্তু সেই কছুয়াদ্বীপ তো দেখিনি, আর দেখা হবে না।

আহা, তুমি এমন করতিছ, যেন বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরঘরে যাচ্ছ, আর তা গেলেও, নাইওর করতি কি আসবা না ?

নাইওর কী ? মাধবী তিতলি একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে। জোড়া কথা হয়। জোড়া কথা মানে ঘরে অতিথি আসবে। কিন্তু চামেলী বলে, জুড়া কথা শুভ, একসঙ্গে দুজনে চাওয়া হয়, যমজ হবে ভাল হবে।

ধ্যাত, তুমি নাইওর বল। তিতলি বলে।

মন খারাপ করে না তিতলি, নাইওরে এস আবার, বছরে একবার তো আসবা ওদের নিয়ে, তুমার হেতাল বেতাল কিংবা ইলি বিলি নিয়ে । চামেলী আবার পান মুখে দিল, বলল, নাইওর হল বাপের বাড়ি ফেরা গো, তুমার বাপের বাড়ি কতদূর গো?

তিতলির শাশুড়ি মাধবী বলে, পাইকপাড়া আর মানিকতলা।

চামেলী বলে, গাঙের পথ তো না ?

ফিক করে হেসে ফেলেছে চম্পা। সে কতবার কলকাতা এসেছে। সরকারী কাজে এসেছে, নিজের কাজে এসেছে। তার শ্বশুরবাড়ি বেলঘরিয়া। কিন্তু স্বামী নিয়ে সে পোরটব্লেয়ারে সেটল্ড। স্বামী এখানের কলেজে কেমিস্ট্রি পড়ান। চামেলী আন্দামান ছেড়ে একবার গেছে কলকাতা হয়ে দিল্লি মথুরা বৃন্দাবন দেখতে। আর যাবে একবার ঠাকুরনগর মতুয়া মেলায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুগামী তারা। যাবে যাবে করে কিন্তু যাওয়া হয় না। সংসারে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে গেছে সে। তার শাশুড়ি বেঁচে নেই। সেই তো র্কত্রী। তার কি বেরোন চলে ? তার তিন ছেলে মেয়ে বড় হয় নি কেউ। তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সবাই। তার কথা শুনতে শুনতে তিতলি ভাবছিল এ কেমন যমজ ? একদম মিল নেই। চম্পা মল্লিক আধুনিক। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আন্দামান প্রশাসনে। বিচার করে। গম্ভীর মুখে রায় দেয়। তার র্গাড আছে। সরকারী গাড়িতে তার সামনে, ড্রাইভারের পাশে বসে থাকে। আর তার যমজ চামেলী একেবারে সরল গ্রাম্য রমনী। কথাই বলে যায় শুধু, বলতে বলতে কী বলে তার ঠিক নেই। এই যেমন বলছে, তার মনে হত তার যমজ হবে, জোড় লাগা কলা খেয়েছিল জোগাড় করে, যা করত জোড়া জোড়া। জোড়া পুতুল ঘরে এনে সাজিয়েছিল। জোড়া কালী, জোড়া লক্ষ্মী আর জোড়া সরস্বতীর পুজো করেছিল। জোড়ায় ছাড়া যেত না কোথাও। কিন্তু হয় নি। ভগবান দেন নি। আর তার স্বামীও চায় নি। তাতে তার খেদ নেই। তারা তো যমজ, চম্পা চামেলী। তারা তো আলাদা। সব দিক দিয়ে আলাদা। দেখতেও আলাদা।

তিতলি বলল, ওপেন সিতে আগেরবার কী ঢেউ আর ঝড় বৃষ্টি !

সুনামীর পর অমন হয়েচে গো। চামেলী বলে।

চম্পা বলল, আবহাওয়া বদল হয়ে গেছে, আকাশ বড় খামখেয়ালি।

তিতলি বলে মা তোমার মনে আছে, সেই ঢেউ আর তীরের ফলার মতো বৃষ্টি, কী ঝাপটা, তুমি চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলে।

হ্যাঁ। সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন মাধবী, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, সুনামীতে কিছু ক্ষতি হয় নি তো তোমাদের ?

হয়েছিল, সামলে নিয়েছে র্কতারা, আমার তখন সবে বিয়ে হয়েছে, শ্বশুরবাড়ি আসার কদিন বাদে সুনামী, জমি ভেসে গিয়েছিল, আমাদের ভিটে থেকে সমুদ্দুর

অনেকটা, আর মাঝে একটা বড় জঙ্গল, তাই বেঁচে গিছি মাসি, না হলি নোতন বউ অপয়া হত, আমি কিন্তু গন্ধ পেইয়েছিলাম।

এই দিদি থাম, কেউ জানত না, তুই জেনেছিলি ! চম্পা এবার ঝাঁজিয়ে ওঠে।

তুই তো বিশ্বাস করবিনে, কেউ করে না, শুধু আমার স্বামী করে। চামেলী বলে।

চম্পা তখন তুমি কোথায় ছিলে? মাধবী জিজ্ঞেস করে।

চম্পা বলে, সে ছিল নদীয়ার তাহেরপুর, তার এক মামা থাকেন সেখানে, মামার সঙ্গে গিয়েছিল দিদির বিয়ের পর, খবর শুনে কী টেনশন যে।

তিতলি জিজ্ঞেস করে, চামেলীদি তুমি কী বুঝেছিলে বলো না।

চামেলী বলে তার তখন একমাস বিয়ে হয়েছে, রস আইল্যান্ডে হানিমুন করতে গিয়ে কী মনে হতে ফেরত এসেছিল, ওখানেই মনে হয়েছিল সমুদ্র স্বাভাবিক নয়, আর তাই বাড়ি ফিরে তার মনে হচ্ছিল তার স্বামী সুকুমার যেন নীল আইল্যান্ডে না যায়। নীল যাবে সে বোট ধরে। চামেলী বলে, রস আইল্যান্ড থেকে ফিরে আগের রাতে সে আচমকা বলেছিল সুকুমারকে, না যাবে না সে। কোথাও যাবে না। বাড়ি থাকবে। থাকবে। থাকবে।

সুকুমার বলেছিল, দুদিন বাদেই তো ফিরবে, একটা জমি দেখেছে রঙ্গতে, সে নীলে হোটেল ব্যবসায়ে নামবে ঠিক করেছিল তখনই। কিন্তু নতুন বউ বেঁকে বসল, না না না। রাতে খুব করে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল সুকুমার, নারকেল বাগান সি বিচের কাছে জমি, হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। তাকে বায়না করে আসতে হবে। তারপর বৈশাখে গিয়ে রেজিস্ট্রি। বিয়ের জন্য বায়না করা ঠেকিয়ে রেখেছিল। রাগারাগি কান্নাকাটি, কী যে মনে হয়েছিল চামেলীর, সে স্বামীকে ঘর থেকে বেরোতে দেবে না। সুকুমার শেষে মেনে নিল। কিন্তু জিজ্ঞেস করেছিল, কেন আটকেছে?

তার ইচ্ছে হয়েছিল তাই। কেন ইচ্ছে হয়েছিল ? কেন না সেই রস আইল্যান্ড। হানিমুনই বলা যায়। রস আইল্যান্ড পোর্টব্লেয়ারের খুব কাছে। খুব সুন্দর। সেখান থেকেই সমুদ্র দেখে দেখে মধুচন্দ্রিমা যাপন করছিল। কিন্তু তার ভাল লাগছিল না। তাল কেটে যাচ্ছিল বার বার। কেন যেন মনে হচ্ছিল জলের রঙ অন্য রকম। সমুদ্র ভয়ের। কেমন ? না, তা বলতে পারবে না চামেলী। তারা তো জন্ম থেকে সমুদ্র দেখে অভ্যস্ত। সে দুদিন আগেই জোর করে ফিরেছিল সুকুমারকে নিয়ে। মনে হচ্ছিল কিছু একটা হয়ে যাবে। সমুদ্রে জলের ভিতর যেন ডুব দিয়ে আছে কিছু। মাথা তুললে প্রলয় ঘটে যাবে।

তুমি সত্যি বলছ চামেলী ? মাধবী জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ, মাসি, আমরা থাকলে ভেসে যেতাম, আর আমার বর রঙ্গতের বোট ধরলে তাকে আর দেখতে পেতাম না। চামেলী বলতে বলতে মাথা নিচু করে। তারপর বলে, আমি যেন ইলি বিলির কেউ, যারা গাঙে নাও ভাসিয়েছিল হেতাল বেতালদের খুঁজতে, তাদের একজন, মনে হয়েছিল সমুদ্র দুলছে।

সমুদ্র তো দোলে। বলেন মাধবী।

এ দুলুনি আলাদা, মাসি আমি তুমারে বলব পরে।

কেন, এখন বলবে না, আমি শুনব না? তিতলি বলে।

না, তুমি নতুন মা হতে যাচ্ছ তিতলি, সব তুমি শুনবা না, তুমি মহাভারতের অশ্বত্থথামার হাতে সেই পাঁচ পান্ডব শিশুর মরণ দেখবা না, সেই কাহিনি শুনবা না যেমন, তেমনি দেবতারা এসে কুন্তির গর্ভে পঞ্চ পান্ডব দিয়ে যাওয়ার কথা শুনবা, তুমারেও ভগবান দিয়েছে ইলি বিলি না হয় হেতাল বেতাল।

তিতলি চুপ করে থাকে। তার মাথায় হাত রাখে চামেলী এক অনতকালের মাতৃরূপ নিয়ে। তিতলি অভিভূত হয়ে যায়। নিজের ভিতরটাকে অনুভব করতে চেষ্টা করে।

চম্পা এবার বলল, দিদির এই কথা অবশ্য সত্যি, হয়েছিল, কী করে হয়েছিল জানিনে, কিন্তু দাদাবাবু আমাকে বলেছিল, দিদির জন্য বেঁচেছে, দিদি এমন সব খেয়ালি কাজ করে, তার কোনোটায় এইরকম হয়ে যায়, কাকতালীয় ভাবে।

চামেলী বলে, না সমুদ্র দেখে আমার খারাপ লেগেছিল, ভয় লেগেছিল গর্জনে, রস আইল্যান্ড ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, রির্সোট জলের নিচে চলে গিয়েছিল, যাক গে, আমি আর আমার স্বামী ঘরে ফিরে এসেছিলাম,আমার স্বামী বিরক্ত হয়েছিল,সবাই অবাক আমরা আচমকা চলে আসায়, আমরা বেঁচেছিলাম আর জারোয়ারা, তাদের কোনো ক্ষতি হয় নি।

অদ্ভুত, তুমি কী করে টের পেলে? বিড়বিড় করে তিতলি।

আমি ইলি বিলির একজন।

কী যে বলিস তুই ! চম্পা মৃদু তিরস্কার করে।

চামেলী বলে, তুই হেতাল বেতালের কেউ না, ডেপুটি ম্যাডাম।

চম্পার মুখে বিরক্তি ফুটে ওঠে। তা দেখেও দ্যাখে না চামেলী, সে বলে,রস আইল্যান্ডে খারাপ লেগিছিল সমুদ্রকে, তাই রঙ্গত যাওয়াও আটকাইছিলাম, দ্যাখো মাসি একটা জারোয়াও মরে নি, তারা হলো গে পাখির জাত, ভগবানের কাছ থেকে আগাম খবর পেয়ে গিয়েছিল শোনা যায়, বুড়ো জারোয়া আর বাগেরহাটের মালোবুড়ো এক, আমার তাই মনে হয় মাসি, হাজার হাজার বছর বেঁচে আছে তারা।

বাইরে অন্ধকার নামছিল। সেই অপরাহ্ণ বেলায় চামেলী বিশ্বাসের কণ্ঠস্বর অপার্থিব হয়ে আসছিল সকলের কাছে। তখন মাধবী জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে বললে না, কী মনে হয়েছিল সমুদ্রকে দেখে।

ভয় লেগেছিল, মনে হয়েছিল জলের তলায় দানবের ঘুম ভাঙছে। চামেলী বিড়বিড় করে বলল।

কী করে বুঝলে ?

জানিনে মাসী।

শুনেছি জারোয়ারা টের পেয়েছিল জলের রং দেখে। মাধবী বললেন।

আমিও তাই মাসী, জলের রঙেই মনে হয়েচিল। কথাটা বলে চুপ করে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকল চামেলী। মাধবীর গা সিরসির করে ওঠে। চামেলী যেন কেমন কেমন। উপজাতি কন্যা নাকি? জারোয়া নারী? সমুদ্র চেনে খুব। মাধবী জিজ্ঞেস করলেন, কী করে বুঝলে?

জানিনে মাসি, শুধু মনে হইচিল জলের নিচে কিছু আছে, ভয়ানক কিছু।

ভূমিকম্প?

হতি পারে মাসি, যা ছিল তা যে ভাল না, সে তো বুঝা গেল। বলে চামেলী নিজের মনে নিজের করেখা দেখতে লাগল। তা দেখে মাধবীও। কেন দেখছেন তা মাধবী জানেন না।

৯

চামেলী বলল, যাওয়ার আগের দিন আসবে আবার।

এস, ক'দিন বাদে তো যাওয়া, পরশু এস চামেলী। মাধবী বললেন।

তিতলির ফোন এল কলকাতা থেকে। তিতির। তিতিরের সঙ্গে তিতলির বন্ধু তানিয়ার দেখা হয়েছিল। তানিয়াকে বলে দিয়েছে তিতির। তিতির বলল, স্যরি, দিদি, আমি বলে দিয়েছি ভুল করে, কিন্তু প্রমিস করিয়েছি কেউ যেন না জানে।

তিতলি হাসে, বলে, তানিয়া, তারপর তানিয়ার কাছ থেকে শুনে রাখি ফোন করেছিল, আর রাখির কাছ থেকে মুনমুন শুনেছে, সেও ফোন করেছিল।

ও মা রাখিদি জানল কী করে?

বললাম তো তানিয়ার কাছ থেকে শুনেছে।

ইস, তানিয়াদিকে প্রমিস করিয়ে তবে বলেছি আমি। তিতির অনুযোগ করল।

কোথায় দেখা হল ?

তিতির বলে, রবীন্দ্র সদন মেট্রোর সামনে, তানিয়াদি বাড়ি ফেরার বাস ধরে ওখান থেকে, আমি মেট্রো ধরতে নামছি, তখন দেখা।

তিতলি বলে, মোটামুটি কলকাতা শহর জেনে গেছে মনে হয় যে আমি ইলি বিলি না হেতাল বেতাল নিয়ে ফিরছি।

স্যরি দিদি, আমি তানিয়াদিকে বলছি।

তিতলি হাসে, বলে, মুনমুন তো ফেসবুক করে, মনে ইওরোপ আমেরিকা এশিয়ার সব দেশে খবর চলে গেছে।

দ্যাখ আমি কিন্তু ফেসবুকে কাউকে বলি নি, লিখিনি।

তিতলি বলে, আমি তো ফিরছি রে, এখন এয়ার পোরটে না ওরা এসে হাজির হয়।

কী যে বলিস দিদি, আচ্ছা রাখিরে। তিতির আচমকা রেখে দিল। আসলে বুঝতে পারছিল কলকাতার অনেককেই সে প্রমিস করিয়ে গুপ্ত কথাটা বলে দিয়েছে। কিন্তু কেউ কথা রাখেনি। যেমন সেও রাখতে পারেনি। তাকে তো তিতলি বলেছিল, কথাটা পাঁচকান না করতে। তিতলির কেমন যেন লাগছে। সে লজ্জা পাচ্ছে। ইস, সে মা হয়ে যাবে ক'মাস বাদে। মা হওয়া আর না হওয়ার ভিতরে কত তফাৎ। বিয়ে হওয়া আর কুমারী থেকে যাওয়ার ভিতরেই বা কত তফাৎ। বিয়ের পর তো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় এসে পড়া। প্রথম প্রথম অসুবিধে তো হত খুব। সবারই তা হয়। নিজের অনেক অভ্যাস ত্যাগ করতে হয়। আবার অনেক কিছু আয়ত্ব করতে হয়। দুজনে মিলে একটা জগত হয়। আগে সে ছিল একা। এখন তার একজন সর্বক্ষণের প্রিয়জন আছে। তার কথা তাকে ভাবতে হয়। সেও তার কথা ভাবে। বেশ বেশ বেশ। আর এখন? বিয়ের পর মনে হয় বিয়ে না হলেই বা কী হত। কিন্তু পেটে সন্তান আসায় মনে হচ্ছে বিয়ে খুব ভাল। রাখিকে তাই বলেছে সে ফোন করলে। রাখি থাকে নাগপুর। সে ঠিক করে নিয়েছে বিয়ে করবে না। তার দিদির বিয়েটা টেকেনি। ডির্ভোস মামলা চলছে। কিন্তু একটা বিয়ে নষ্ট হয়েছে বলে, সব বিয়ে কি তা হয় ? রাখির প্রেমিক সুমন্ত মন মরা হয়ে একদিন আচমকা ফোন করেছিল তিতলিকে। তিতলি তখন কিছু বলতে পারেনি, কিন্তু পরে রাখি তাকে অভিনন্দন জানালে, সে বলেছিল, তুই মিস করবি রাখি, কী অদ্ভুত এক অনুভূতি। কী যে হচ্ছে আমার ভিতরে ! আমার আবার টুইন। আই ক্যান ফিল দেম। তিনটে হার্ট আমার ভিতরে, কী দারুন ব্যাপার, আমি বলে বোঝাতে পারব না।

সব গোছগাছ চলছিল। তিতলির মন খারাপ হচ্ছিল। ইস খেলার সংসারের মতো সব ভেঙ্গে দিয়ে চলে যেতে হচ্ছে। আন্দামানে কি মানুষ জন্মায় না? কিন্তু এও তো ঠিক সারাদিন সে একা। সে থাকবে যমজদুটিকে নিজের ভিতর নিয়ে আর অভি থাকবে অফিসে। অভিকে মাঝে মাঝে অনেক দেরি করে ফিরতে হয়। আবার দিল্লি যেতে হয়, হায়দরাবাদ। তখন একা থাকতে হবে তাকে। শ্বশুরমশায় এখনো চাকরিতে। তাঁরা এসে তো থাকতে পারবেন না। মা বাবাও না। তিতির কোথায় থাকবে? সে তো আর সব বন্ধ করে আন্দামানে এসে বসে থাকতে পারবে না। সুতরাং তাকেই যেতে হবে। আর অভি পরের মাসে সল্টলেক সেক্টর ফাইভে গিয়ে জয়েন করতে পারে। সে অনেকদিন ধরে আন্দামান ছাড়তে চাইছিল, কিন্তু রাজি ছিল না তিতলি। এখন তাকেই কলকাতায় ফিরতে হচ্ছে যখন অভিও যেতে পারবে। এক-দু'মাস দেরিও হতে পারে, কিন্তু সে ক'দিন ধরে অন-লাইন ইন্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছে। মনের মতো পেলেই ফিরে যাবে পাকাপাকি। তখন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে চিরতরের মতো সর্ম্পক ছেদ। মন তাই আরো খারাপ। অথচ সে

তো নিজের শহর নিজের বাপের বাড়ি ফিরছে। নাইয়রে যাচ্ছে। নাইয়র মানে নিজের বাবা মা ভাই বোনের কাছে ফেরা। তা বলল, চামেলী বিশ্বাস। তখন মানে সেই অনেক অনেক বছর আগে পূববঙ্গের পরম্পরা তা। যাতায়াতের উপায় ছিল তো নৌকো। নদীর ঘাটে ঘাটে গ্রাম। বিয়ে হতো নদীর ধার থেকে নদীর ধারে। গাঙে গাঙেই তো যাওয়া আসা। এক গাঙের ধারে বাপের বাড়ি, অন্য গাঙের ধারে শ্বশুরবাড়ি।

কী সুন্দর বলছিল চামেলী আবার এসে। ঠিক দুপুরে হাজির। তিতলি চলে যাবে। তিতলির উপর ভালবাসা জন্মে গেছে যে। মেয়ে যে শ্বশুরঘরে এল, আর তাকে নিয়ে যায় না কেউ এসে বাপের বাড়ি। শ্বশুরবাড়িতে সে কেমন আছে ভাই বাপে এসে খোঁজ নেয় না। মেয়ে গাঙের ধারে গিয়ে দ্যাখে নাও চলেছে উজানে উজানে। ওই উজানেই তার বাপের বাড়ি, মায়ের কোল। আহা এমন ভাবে বলে গেছে চামেলী আজ দুপুরে যে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। চামেলীকে আজ চম্পা পৌঁছে দিয়ে গেছিল। আবার নিয়েও গেছে তার অফিসের গাড়ি এসে। চামেলী বলল, জোড়া ঠাকুরের থানের ফুল। জোড়া ঠাকুরের থান ছিল মালোপাড়ায়। কিন্তু চম্পা চামেলীর জন্মের পর তাদের ঠাকমা সেই দিগলিপুরে জোড়া ঠাকুরের পুজো করে থান প্রতিষ্ঠা করেছিল। চামেলী ফোন করে ভাইকে ফুল পাঠাতে বলেছিল। একজনের মারফৎ তা পেয়েছে চামেলী এই পোর্ট ব্লেয়ারে। সেই ফুল দিতে এসেছিল তিতলিকে। তিতলির এসবে তেমন বিশ্বাস নেই। কিন্তু এর সঙ্গে যে সেই অলৌকিক মালোপাড়া আর হেতাল বেতাল, ইলি বিলির কাহিনি জড়িয়ে আছে। জোড়া ঠাকুর কারা ? বোধ হয় তারা কোনো এক জোড়া। তাদের মূর্তি মানে কাদার পিণ্ড, তারা ভ্রুণের মতো প্রায়। তা শুধুই ছায়া পিন্ড। মাংসের দলা। আসলে সে বুঝি যমজ ভ্রুণ, যমজ ভ্রুণ হলেন জোড়া ঠাকুর। বাগেরহাট মালোপাড়ার ঠাকুর। মা তিতলি সেই ফুল কপালে ছুঁইয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। তারপর ব্রত কথার মতো শুনেছে নাইয়রের কথা। সে কাহিনি খুব সুখের নয় গো, তবু শোনানো যায় তিতলিকে। তিতলির মনের ভিতর সেই বালিকা বধূর প্রতি ভালবাসা জেগে উঠবে। তিতলি সেই বিয়ে হয়ে অনেকদূরে যাওয়া এক গাঁয়ের বধূর মনোবেদনার কথা শুনেছে চামেলীর কাছে। চামেলী কী অদ্ভূত ! সে ওই দেশ দ্যাখেনি, কিন্তু ওই দেশের দুঃখ আনন্দ ধরে রেখেছে নিজের ভিতরে। সব তার ঠাকমা শিশুবালার কাছ থেকে পাওয়া। শিশুবালা পা মেলিয়ে বসে গুনগুন করত,

লাল বৈঠা বেয়ে যাও কোন সদাগর,
আমার ভাইয়ের কাছে কইও খবর।

চামেলীও পা ছড়িয়ে বসেছে তিতলির খাটের উপর। কচরমচর পান চিবুতে চিবুতে চামেলী সেই দুপুরে যেন শিশুবালা হয়ে গিয়েছে। দুপুরটা ছিল তার আর চামেলীর। শাশুড়িমা ঘুমিয়ে পড়েছেন পাশের ঘরে। শ্বশুরমশায় গিয়েছেন আন্দামানের অ্যাকোরিয়াম

দেখতে। তারপর আর একবার যাবেন সেলুলার জেল দেখতে। উনি বলেন, তীর্থস্থান, আর কি আসা হবে আন্দামান ?

চামেলী বলে, কচি মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছে কোন দূর গাঁয়ে। গাঙ ছাড়া পথ নাই, আর সেই মেয়ের খুব কষ্ট শাশুড়ি ননদের গঞ্জনায়। কার কাছে সে দুঃখের কথা বলবে গো, শোনার কেউ নেই। গাঙ বেয়ে যাওয়া সওদাগর যেন শোনে তার কথা। তা থেকে তার ভাই, ভাই যেন তাকে আশ্বাস দেয়,

থাক থাক ভইন গো গাঙের দিকে চেয়ে,
আশ্বিন মাসে নিতা আসব পাটের টাকা পেয়ে।
ধলা পাটের ধলা রোশনাই বাতাসে উড়ায়,
এমন সুন্দর ভইন আমার পরের ঘরে যায়।

আশ্বিনে ভাই আসে? তিতলি জিজ্ঞেস করেছ।

তাকি আর আসেরে ? তেমন কপাল কি তার, বড় পুজো এল, উমা ছেলেমেয়ে নিয়ে এল বাপের বাড়ি, সব বউরা বাপের বাড়ি যায় নাইওরে, শুধু সেই মেয়ে পড়ে থাকে শ্বশুরঘরে। আশ্বিনে ভাই এল না। গাঙে কত ব্যাপারীর নাও যায় ভেসে, শুধু তার ভাইয়ের পাটের নৌকোর দেখা মেলে না। কিন্তু গাঙের ধারে এসে সেই মেয়ে ডাক দেয়,

ধলা বৈঠা বেয়ে যাও কোন সদাগর,
আমার ভাইধন-এর কাছে কইয়ো খবর।

শুনতে শুনতে তিতলি বলে, অ চামেলীদি, এ যে শচীনদেবের গান।

হ্যাঁরে তাঁর গান, সে গান তো নাইওর নিয়েরে, তো সেই মেয়ের আশা ফুরোয় না, সে ভাবে, ভাই তার আসবে, ভাই যেন তার ডাকে সাড়া দেয়,

থাক থাক ভহিনগো গাঙের দিকে চেয়ে
অঘ্রানেতে নিতে আসব ধানের টাকা পেয়ে।
ষাইটা ধানের ঝিকিমিকি কেরি পুকায় খায়,
এমন সুন্দর ভইনরে পরে নিয়া যায়।

চামেলীর কণ্ঠস্বর সুন্দর। সে গুনগুন করে গাইতে থাকে নাইওরের গান। সে যখন পোয়াতি হয়েছিল, নাইওরের কথা তাকে শুনাত তার মা। মা জানে। পোয়াতিকে নাইওরের গান শুনাত তাদের পূববঙ্গের গাঁয়ে। তাতে কী হয় সে মনে মনে কেন জানে না মা হয়ে উঠতে থাকে। চামেলী বলে, সেই বউ মনে মনে ভাবে তার বাবা-কাকাদের জমিতে অঘ্রানের ধান পেকে হলুদ হয়ে গেছে। শিশিরে শিশিরে সেই ধান ভিজেছে সমস্ত রাত। সকাল থেকে তার জোয়ান ভাই জন-মুনিষ নিয়ে ধান কাটতে লেগেছে। চারদিকে ধান কাটার ধুম লেগেছে। তারপর সেই ধানে নৌকো বোঝাই করে ভাই চলল হাটে। ধান বেচে খুব লাভ করল। এবার সে আসবে বোনকে নিতে। কিন্তু দিন যায়, আসে না তো ভাইয়ের

নাও। কিন্তু আশায় তো বুক বাঁধতে হয়। তার মনে হয়, সামনে আর একটি চাষ, রবি ফসল উঠবে, তা বেচে আসবে ভাই...।

কালো বৈঠা বেয়ে যাও কোন সদাগর,
আমার ভাইধন-এর কাছে কইও খবর।

তিতলির চোখে জল এসে গেল, এল না ভাই?

না, ভাই কি আসতি পারে, তার কত কাম, আবার মুক্তিও হইছে ভাই, তখন মুক্তিযুদ্ধ, জানিস তার কথা?

তিতলি বলল, জানি, বাবা বলেছে, পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হলো।

চামেলী চোখ মোছে, তার চোখও ভিজে গেছে তিতলির মতো, বিড়বিড় করে সে বলে, ঠাম্মা এক গল্পর সাথে আর এক গল্প মিলাতোরে, মুক্তি হইছে ভাই, তাই আসতি পারে নি, আবার চাষের কাজের জন্যিও হতি পারে, ধান খেল বুলবুলিতে, তাই আসে নি, গরিবের মেয়ের এমন হয় রে, তবু কি আশা যায়, যায় না, মেয়ে ভাবে, সামনে সর্ষে উঠবে, সর্ষের টাকা পেয়ে আসবে সে, ভাই যেন তাই শোনায়,

থাক থাক ভইন গো গাঙের দিকে চেয়ে
মাঘ মাসে নিতা আসব সরষার টাকা পেয়ে।

বোনের আশা যায় না। শ্বশুরবাড়ির শত নির্যাতনেও সে মনে মনে ভাবে ভাই আসবে, ভাই যেন মনে মনে বলে,

সরষাফুলের ফরসা জীলা বাতাসে উড়ায়
এমন সুন্দরী ভইনকে পরে লয়ে যায়।

বলতে বলতে চামেলীর গলাও ভার হয়ে আসে। শেষে বলে, সেই বউ তো দশ-এগারো, সংসার করার উপযুক্ত হয় নি। তার তো পুতুল খেলার বয়সে বিয়ে হয়েছিল।

ভাই আর এল না?

আসার সুময় হয় না তার, সে ছিল কতদূরে, যুদ্ধ করতে গিয়েছিল চাষার ছাওয়াল। বন্দুক কাঁধে লুকাই থাকত বাঁশ বনে, ঘাস বনে। মুক্তি শিবিরে। খপর লিয়ে যেত খান সেনাদের। তাই তার আসার সুময় ছিল না। ইদিকে বুন তো ভাইয়ের জন্যি গাঙধারে বসে থাকে। নাওরে ডাকে। পরে তার গাঙধারে যাওয়া বন্ধ হলো। খান সেনারা গাঙে ঘোরে লঞ্চ নিয়ে। ঘাটে মেয়ে দেখতি পেলি তুলে লিয়ে যায়, অত্যাচার করে গাঙে ডুবাই দেয়। কত উদোম মেয়েমানুষির লাশ ভেসে আসে গাঙের জলে। বুন ঘরের অন্ধকারে বসে গাঙের মাঝিরে ডাকে মনে মনে, সদাগরেরে ডাকে, কালা বৈঠা বেয়ে যাও কোন সদাগর......।

শুনতে শুনতে তিতলি জিজ্ঞেস করে, তাহলে ভাই এল না?

যদি বেঁচে থাকে, খান সেনা আর রাজাকারের হাত থেকে বাঁচতে পারে তো এল ভাই, ভাই এল অনেক সিজিন ফসল কাটার পরে, কিছু টাকা হাতে আসার পর, ভাই এল

মুক্তিযুদ্ধ শেষ করে, খান সেনাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে, স্বাধীনতা যবে এল তারও পর। বাংলাদেশ হওয়ার পর ভাই এল জয় বাংলা ডেকে.........আমার সুনার বাংলা গেয়ে গেয়ে।

বাহ চামেলীদি, বাহ, কী সুন্দর গল্প বল তুমি! তিতলির চোখে আলো, বোনকে নিয়ে গেল ভাই এতদিন বাদে?

না , তা হলো না খুকি। চামেলী আবার পান মুখে দেয়।

কেন গো, শ্বশুরঘরে আটকে গেল?

নারে না, যখন সে বোনকে নিতে এল, সেই কোনো এক ফাগুন-কি চৈত মাসে, তখন বসন্তের রং লেগেছে আকাশে বাতাসে, গাছ-গাছালিতে, বালিকা বধূও ততদিনে বড় হই গেছে। বালিকা নেই আর। তা থেকে মুক্তি হয়েছ তার। মেয়েমানুষ নিজির ওই রক্ত দেখিছে নিজি নিজি। শরীর বদলি গেছে। মনে রং লেগিছে তখন। নারী হয়ে গেছে সে। আর গেল না রে স্বামী সোহাগিনী বউ।

গেল না ? তিতলির দম আটকে আসছিল, কিন্তু দম নিতেও পারল, বলল, শ্বশুর বাড়ি ভাল হয়ে গেছে তখন !

হবেই তো, শ্বশুরবাড়ি তো রাজাকারের বাড়ি ছিল না।

তারপর আর কিছু নেই ?

আছে রে আছে। চামেলী বলে।

কী আছে গো চামেলীদি ?

চামেলী গাল টিপে দিল তিতলির, বলল, জোড়া ছেলে এল, হেতাল বেতাল।

ওমা তাই ?

হ্যাঁরে হ্যাঁ, হেতাল বেতালেই তো মালোপাড়ার যমজের শুরু।

এটা কি মালোপাড়ার গল্প।

ঠাম্মা বলত তাই, ঠাম্মার বাপের বাড়ি ছিল অনেক দূর।

কতদূর ?

গাঙে গাঙে দুদিন লেগে যেত, সে ছিল গহীন গাঙের দেশ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, কুমিল্লা।

অতদূরের মেয়ে এদিকে বিয়ে হল কী করে?

আমার ঠাকুদ্দা গিয়েছিল সদাগরি করতে না কী করতে, বে করে ফিরেছিল, লাভ ম্যারেজ বলতে পারিস। হা হা করে হাসতে থাকে চামেলী। সেই হাসিতে যোগ দেয় তিতলিও। চামেলী বলে, সে যখন পোয়াতি হয়ে বাপের বাড়ি গেল, সেই দিগলিপুর, ঠাম্মা তাকে শুনিয়েছিল এই গল্প। ঠাম্মার এক বুন এসেছিল নাকি মুক্তির সময় তিন বেটা খুইয়ে, আমাদের দিগলিপুর, সে বলেছিল মুক্তি আর নাইয়রের কথা, না ঠাম্মা এখন বেঁচে নেই। তার জোড়া হয়নি তাতে আশাহত হয়েছিল বুড়ি। জোড়া ঠাকুরের কাছে মানত

করেছিল যে। ঠাকুর কথা রাখেনি। তাতেই বুড়ির দেহত্যাগ যেন। ঘুমের ঘোরে চলে গিয়েছিল।

১০

হেতাল কে বেতাল কে ? একজন জিজ্ঞেস করে আর একজনকে।

কে আবার, আমি তাদের নাম শুনিনি। ঝিলমিল জবাব দেয়।

তুই কী রে, চামেলী গল্প শোনাল যে সারাদুপুর। ধিতাং বলে।

কে চামেলী ?

ধিতাং বলে, চামেলী গল্প বুড়ি।

যাকগে যাক, মা বলবে ঠিক। ঝিলমিল হাঁই তোলে।

এই তুই শুনলিনে তো। ধিতাং বলে।

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম।

তুই এত ঘুমাস কেন ?

আমার ঘুম পায়, ভাসতে ভাসতে ঘুমতে আরাম হয়।

পর্দার এপার আর ওপারে কথা হয়। তারা নাও ভাসিয়ে আছে দুজন। তাদের মা এখন উড়ানে। তারা উড়ছে। কিন্তু টের পাচ্ছে কী ? ঝিলমিল বলে, তার যেন কী একটা মনে হচ্ছে, কী রে কী , মা এখন কী করে?

ধিতাং বলে, ঘুমায় ঘুমায়।

আমরা এখন কি সমুদ্দুরে আছি ?

ধিতাং বলে, একবার খুব ঢেউ দিল, এখন সব থেমে আছে, আকাশে আছি।

আকাশ কী ? ঝিলমিল জিজ্ঞেস করে।

মনে হয় সেও এক সমুদ্র, আমরা আকাশে ভাসছি। ধিতাং বলে।

আকাশ আকাশ আকাশ, কী সুন্দর নাম, আকাশ কে?

ধিতাং বলে, কেউ না, কেউ না আকাশ আমার ভাই।

মোটেই না আকাশ আমার ভাই। ঝিলমিল বলে।

মোটেই না।

মোটেই হ্যাঁ, আকাশ আমার ভাইই ভাইই।

ধিতাং বলে, ভাই কীরে ?

সে তো তুই জানবি, তুই বললি আকাশ তোর ভাই।

জানি না, একদিন তিতলি বলল, ভাইরে ডাকে বোন, নাইয়র, তুই তো কভু শুনিসনি, শুধুই ঘুমাস।

কী ডাকে রে কী ডাকে?

অত আমার বলতে পারব না, তিতলি জানে। ধিতাং বলে।
মনে নেই তো বললি কেন, শুনলি কেন?
ধিতাং বলে, মন কী রে?
মন না হলে বলা যায় না। ঝিলমিল বলে।
হুঁ, আমার মন আছে।
তাহলে বল। ঝিলমিল বলে।
আমার মন তিতলির কাছে। ধিতাং বলে,

সরষাফুলের ফরসা জীলা বাতাসে উড়ায়
এমন সুন্দরী ভইনকে পরে লয়ে যায়।

তার মানে ? ঝিলমিল জিজ্ঞেস করে।
তিতলি জানে। ধিতাং বলে।
সরষা ফুল কী ?
তিতলি জানে। ধিতাং বলে।
ঠিক আছে আমি তিতলির কাছে শুনে নেব। ঝিলমিল বলে।
জানবি কখন তুই তো শুধু ঘুমাস।
ঝিলমিল বলে, তিতলি যে বলে ঘুমাও সোনা ঘুমাও, কভু জেগো নি।
হি হি করে হাসে ধিতাং, কভু বললেই কভু শুনতে হবে ?
এই কভু কী ?
ধিতাং বলে, হি হি হি, তিতলি আমাদের ঘুমাতে বলবে, আর চামেলী তাকে গল্প শুনাবে, নাইয়োর শুনাবে, ইহারে কভু বলে
নাইয়োর কী ?
তুই ঘুমা, নাইয়োর শুনে কী করবি। ধিতাং বলে, এই যে আমরা এখন আকাশে, খুব ঢেউ দিল যখন উড়ল তিতলি, বলল, আকাশে উড়ব সোনা ঘুমাও।
ঝিলমিল জিজ্ঞেস করে, ঘুমুবি তো, ঘুমাস নি কেন ?
ইস ওরা কত গল্প করে, কত শুনায় কত হেতাল বেতাল ইলি বিলির কথা, জোড়া ঠাকুরের কথা, ঘুমোলে শুনতে পেতাম।
আহা, ওসব শুনতে নেই। ঝিলমিল বলে।
কে বলল শুনতে নেই ? ধিতাং জিজ্ঞেস করে।
আমি জানি না, আমি জানি না, কেউ বলেছিল শুনতে নেই। ঝিলমিল বলে।
কবে বলল রে ? ধিতাং জিজ্ঞেস করে।

কবে মানে কী ? ঝিলমিল জিজ্ঞেস করে।

কখন ?

ঝিলমিল হেসে বলে, কী জানি কখন।

এখন না তখন ?

ঝিলমিল বলে, এখন আর তখন।

ইস, তা আবার হয় নাকি?

ঝিলমিল আর ধিতাং সমুদ্রজলে ভাসে। আর সেই অনন্ত জীবনসমুদ্র নিয়ে আকাশে উড়েছে তিতলি। উপরে আকাশে তিতলিদের উড়ানে একটা ঝাকুনি হল যেন। তিতলি তার পেটের উপর হাত রাখল। অভি বলল, কী হল ?

কী হবে, তারা জেগে জলে দোল খাচ্ছে।

তুমি সব বুঝতে পারো? অভি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

তিতলি জানালা দিয়ে নীল, ঘননীল আকাশ আর তার ভিতরে পেঁজা তুলোর মতো মেঘপুঞ্জ দেখতে পায়। মালোবুড়োর দাড়িচুল সব ভেসে যায় যেন আকাশমন্ডলে। সে অভির কাঁধে মাথা রাখল, বলল, সব, দুটোর ভিতরে একটা খুব দুষ্টু।

এখনই তা টের পাও?

হ্যাঁ গো, গান বাজলেই দোল খায়। তিতলি বলে।

ইস, তারা কি গান বোঝে?

খুব বোঝে গো খুব বোঝে, সুরের দোলায় দোলে। তিতলি বিনবিন করে।

তিতলির কথায় অভি অবাক হয়ে তিতলির মুখের দিকে তাকায়। কী যেন ভাবে। আলতো আঙুল ছোঁয়ায় মাতৃগর্ভে। কিছুই আন্দাজ করতে পারে না। তখন বলে, একটা ছেলে একটা মেয়ে?

আমি জানি না, তবে ইলি বিলি হতে পারে।

ইলি বিলি মানে ? অবাক হয়ে অভি জিজ্ঞেস করে।

তিতলি হাসে, হেতাল বেতাল।

তার মানে কী? অভি জিজ্ঞেস করে।

তিতলি বলে, মালোবুড়ো।

সে কে ? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে অভি।

কেউ না গো কেউ না, আমার বাবা বলত বাবা প্রথমে প্লেনে চেপেছিল জন্মানর আগে, মায়ের পেটে যখন। তিতলি বলে।

তোমার বাবা জানেন?

না জানলে বলবে কেন?

তোমার ঠাম্মা বলেছিল? অভি জিজ্ঞেস করে।

বাবা বলে সব মনে আছে।

ইস, তখন কী মনে রাখার মতো ব্রেন হয় ! অভি বোঝাতে চায়।

তিতলি বলে, আমি কী করে জানব, উফ ওরা এমন করছে না, ওরা বুঝতে পারে যে আকাশে উড়ছে।

কী যে বল, সবে তো একমাস।

তা আমি জানি না। তিতলি আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। অভি বলল, তুমি ঘুমাও।

ঘুমাতে দেবে ওরা ?

তখন অভি তিতলির মাথায় স্নেহের হাত রাখে, তুমি ইউনির্ভাসাল মাদার, ইস তিতলি তোমার মনে খুব আনন্দ তাই না।

তোমার কি আনন্দ হয় নি!

খুব হয়েছে, সবার খুব আনন্দ হয়েছে, তুমি দেখবে এয়ারপোরটে কতজন হাজির আনন্দ করতে করতে, গোটা কলকাতা।

তিতলি হাসে, হ্যাঁ, তিতির মোটামুটি মাইক ফুঁকে বলে দিয়েছে। বলতে বলতে তিতলি বাইরে তাকিয়ে দ্যাখে নীল নভমন্ডল। আকাশ সমুদ্র। সমুদ্রে যেন শাদা মেঘের ঢেউ আর ঢেউ। অভি দ্যাখে তিতলির ভিতরে মায়ের তন্ময়তা এসেছে। সে অনুভব করছে সন্তানদের। এই অনুভবের সময়টুকু সুন্দর। এই সময়টুকুতে কথা না বললে ভাল। নিজের ভিতরে ডুবে যাক তিতলি। অভি চোখ বোঁজে। আর তখন তিতলি দ্যাখে এক সাম্পান। তার দুই দিকে দুই জন বৈঠা নিয়ে বসে আছে। আকাশসমুদ্রে সেই দূর মালোপাড়া থেকে যাত্রা করা মালোদের নাও । তার উড়ানের পাশাপাশি চলেছে সেই নৌকা। এই তিতলি তিতলি, এই আমাদের দ্যাখ।

ইস, তোরা আকাশে, আকাশে কেন, আমার কাছে আয় !

আকাশে নারে না সমুদ্দুরে। ধিতাং বলে।

ঝিলমিল বলে, এই তুই তিতলিরে ঘুমাতে দে।

ধিতাং বলে, আয় তিতলি তোরে ঘুম পাড়াই, হি হি হি।

এই তুই চুপ কর না, ঘুমচ্ছে। ঝিলমিল বলে মৃদুস্বরে।

ইস, চোখ বুঁজে আছে, ও তিতলি ঘুমালি ?

ঘুমুতি দিবি তোরা। তিতলি ফিসফিসিয়ে বলে, সোনারা আমার ভিতরে আয়।

আছি রে তোর ভিতরে আছি তিতলি মা। ধিতাং বলে, আয় আমরা তোকে ঘুম পাড়াই,

মা ঘুমোল চোখ বুঁজাল গাঙে লাগসে ঢেউ
ইলি জাগে বিলি জাগে আর জাগে না কেউ।

যাহ, তুই কী বলিস, মা কি কখনো আমাদের জাগিয়ে রেখে ঘুমাতে পারে ? ঝিলমিল বলে।

পারে, পারে, ও তিতলি ঘুম যা, আয় ঘুমরে যায় ঘুমরে, এক সমুদ্দুর ঘুম ।

কী অদ্ভূত! তিতলি শুনতে পায় ঘুমপাড়ানি। সে নিজে যেন ওই সাম্পান হয়ে শুয়ে আছে। তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ধিতাং আর ঝিলমিল। ইলি বিলি হেতাল বেতাল।

তিতলি ঘুমায় সোনার নাওয়ে,
নাও পেল সাত সমুদ্দুর।
গহীন গাঙে তিতলি যায়
আর যাবে সে কদ্দুর ?

ওই দেখা যায় ঘর বাড়ি, আর একটা নদী। রাস্তা আর রাস্তা। সবুজ মাঠ আর সবুজ গ্রাম। ওই এল যে গাঙের কুল। গঙ্গাতীরের শহর। তিতলির নাও চলে এল। সাম্পান। অভি তার পিঠে হাত রেখেছে, কলকাতা এসে গেল তিতলি।

তাই, কই তারা? তিতলি ধড়মড় করে উঠল।

তুমি কি স্বপ্ন দেখছিলে ?

না তো। তিতলি বাইরে তাকায়। আকাশ এখানে আরো ঝলমল। সে আকাশে তাদের সাম্পানটি খুঁজতে খুঁজতে নিজের ভিতরে তাদের স্পন্দন যেন টের পায়। হ্যাঁ, পেটে হাত রেখে সে বুঝল, তারা ফিরে এসেছে। ফিরে এসে দুষ্টুরা চুপ করে আছে। সামান্য যেন স্পন্দন, তারপর সব থির। প্লেন এবার নামবে। সে সিট বেল্ট বেঁধে নিল। তারা যেন টের পেয়েছে সব। সমুদ্রে এখন শ্বাস নিচ্ছে ধীরে ধীরে। খুব শান্ত হয়ে। চোখ বুঁজে। একটু একটু নড়ে জানান দিচ্ছে আমরা তোমার সঙ্গে এলাম মা। আমরা তোমার বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি এলাম মা। আমরা এলাম কলকাতা। কলকাতা না কলিকাতা। ওই দ্যাখো মা কতজন, কত মানুষ, কত শব্দ কত দোলন। আহা মায়ের বাপের বাড়ি কলিকাতা।

মালোপাড়ার মাইয়া তুমি, মালোপাড়ায় ফিরা হল।
ইলি বিলি, হেতাল বেতাল, তোমার গভভে জন্ম নিল।

১১

অনিমেষ এখন অবাক হয়ে মেয়েকে দ্যাখে। মেয়ের চোখমুখে যেন আলোর বিভা। একমাসেই তো সে বদলে গেছে। মুখময় করুণার আলো ফুটে উঠেছে। সে কদিন আছে এই বাড়িতে। তারপর যাবে ওই বাড়ি। তার হাসি দেখতে সুন্দর লাগে। সে যখন বলে, বাবা তুমি সুজাত হোসেন বাজাও, রাগ ঝিনঝটি, পিয়া ঘর আয়ে, পিয়া ঘর আয়ে......, অনিমেষ তার যৌবনকালের লং প্লেয়িং রের্কড বাজিয়ে দেয় সকালের আলো ফুটলে। সমস্ত

ফ্ল্যাটে সুজাত হোসেন তার কণ্ঠের জাদু নিয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকেন। তিতির ঘুমোতে ঘুমোতে বলে, উফ, বাবা একটু আস্তে কর না, আমি সেই কত রাতে ঘুমিয়েছি।

কিন্তু আস্তে করতে হয় না। কথাটা বলেই আবার ঘুমিয়ে পড়ে তিতির। ঘুমোয় না যেন, সুরের ভিতরে ডুব দেয়।

অনিমেষের সেই এক বহু পুরোন অভ্যাস রাত পোহানর আগে ঘুম ভেঙে ওঠা। এর সঙ্গে জুড়েছে নতুন নেশা। শেষ রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে, সে তিতলির পাঠান সেই আশ্চয মেল খোলে কম্পিউটারে। স্ক্যান রির্পোট। দুই যমজে জেগে ওঠে তার সামনে। তখন রের্কডে সুজাত হোসেন বাজেন কিংবা বাজেন বড়ে গুলাম আলি, ভৈরবী রাগে। খুব আস্তে। কম্পিউটার-ঘরের দরজা বন্ধ করা থাকে। গান সে শোনে আর মনে হয় তারাও বুঝি সমস্ত রাত অপেক্ষা করে থাকে গানের জন্য, সুরের জন্য। অনিমেষের সত্যি মনে হয়। তারা চঞ্চল হয়ে ওঠে সুর ছড়িয়ে পড়লে। তারা সুরের দোলায় দুলতে থাকে।

এই, তুমি খুউউব ভাল। একজন বলে।

আর একজন বলে, গ্র্যান্ড পা, তুমি কি গান পা, হি হি হি।

এই ধিতাং এমন বলে না।

ইস কেন বলে না ?

ঝিলমিল বলে, তা জানি না।

ধিতাং বলে, তুমি কি মালো বুড়ো ?

না গো তুমি তিতলির বাবা। ঝিলমিল বলে।

মালো বুড়ো কি তিতলির বাবা? ধিতাং বলে ওঠে।

না গো না, তিতলির বাবা গান পা। বলে খিলখিল করে হাসতে থাকে ঝিলমিল, বলে, মালোবুড়ো কে হয়, তিতলির কেউ না হয়, নাকি তার গান হয়, হিহিহি, গান পা।

কী সব কথা শুনছে অনিমেষ ! ঘরে বাজছেন আমজাদ আলি খাঁ। তাঁর সরোদের মূচ্ছনা ঢেউ তুলছিল আলোর। আবার তার ভিতরে জড়িয়ে যাচ্ছিল গান পা গান পা ডাক। খিলখিল হাসি। সমস্তটা জুড়ে গিয়ে সমুদ্রের দোল আসছিল ব্রহ্মান্ডে। জানালা খুলে দিল অনিমেষ। বাইরে তখনো সমুদ্রনীল অন্ধকার। একটা বুড়ো কাক তার সঙ্গে প্রতিদিন জেগে ওঠে। তার অনেকদিন তো হয়েছে পৃথিবীতে। গাছে, শূন্যতায়, দিবসে রাত্রিতে। ঘুম হয় না ভাল। সেই কাক ফিকে অন্ধকারে ডাক দিল, ও বড়বাবু, কার সাথে কথা বল ?

কই না তো, গান বাজছে। অনিমেষ বলে।

না আমি টের পাই কচি গলা, খিলখিল হাসে। বুড়ো কাক বলে।

চুপচুপ কাউকে বল না।

আর কেউ শুনতেও পাবে না। বুড়ো বলল।

তখন ধিতাং বলে ওঠে, মালো বুড়ো।

কই রে ? ঝিলমিল জিজ্ঞেস করে।

ওই যে ওই, কথা বলে।

ধেত, ও যে তিতলির বাবা তোর গান পা।

না, সে মালোবুড়োর সঙ্গে কথা বলে, চুপ করে শোন।

অনিমেষ বাইরের অন্ধকার ফুরিয়ে আসা দেখছে। বুড়ো কাক ডাকল তাকে, ও বড়বাবু, তারা কী বলে?

অনিমেষ বলে, খিল খিল খিল হাসে শুধু।

হুঁ, কত সমুদ্দুর পার হল গো তারা, তবে তো পেল তাদের মাকে।

অনিমেষ বলে, তুমি জান ?

আমি তো দেখি সমস্ত রাত ধরে নাও বেয়ে যায় তারা, চাঁদের সাম্পান বেয়ে মায়ের খোঁজে যায়, মা না পেলে জগতে তাদের আনবে কে, বল বড়বাবু।

অনিমেষ বলে, তুমি জান সব ?

সব জানি, সমস্ত দিন সমস্ত রাত আমি তো দেখি, দেখে যাই, বুড়োর আর কাজ কী, ডানায় তো জোর নেই, সবাই ওড়ে আমি দেখি, সবাই ভাসে আমি দেখি, আমি বলি যা ভেসে যা, দূর পরবাসে যা, মা পাবিরে যা।

শুনতে শুনতে অনিমেষ দেখল আলো জন্মাল এই ভূ-মন্ডলে। পাখপাখালি জেগে উঠল, প্রাচীরের ওপারের পাম-ট্রি থেকে উড়াল দিল জোড়ায় জোড়ায় পাখিরা। মালোবুড়ো ভাসিয়ে দিল তাদের। মানুষ তো পাখির মতোই প্রায়। পাখিরই জাত। তার মেয়ে বলেছে, জারোয়ারা পাখির জাত বাবা। তাকে সেই কথা বলেছে কোনো এক চামেলী মল্লিক। জারোয়ারা ভগবানের কাছ থেকে খবর পেয়েছিল সুনামী আসছে, তাই তারা মরে নি কেউ। পাখিরা সারাদিনে ভগবানের কাছে যায় উড়ে উড়ে। তিতলি আলাদা কেউ হয়ে ফিরেছে যেন পোর্টব্লেয়ার থেকে। এই মেয়ে সেই মেয়ে নয়।

তিতলি বলে, শোনো বাবা, মালোবুড়োর কথা শোনো...........।

অনিমেষ অবাক হয়ে শুনেছে সব। তিতলি বলে, মালোরা ওইদেশে আছে এখনো, গাঙ খুঁজে পায় নি এপারে এসে, আবার ফিরে গেছে।

অনিমেষের মনে হল, মালোবুড়ো পাখি হয়ে আছে কোথাও। মানুষ পাখির জাত। আর সেই অতি প্রাচীন বৃদ্ধ তো পাখি হতেই পারে। রূপকথা-উপকথার দিন তো ফুরিয়ে যায় নি। পৃথিবীর কোথাও না কোথাও তারা রয়ে গেছে হিরে মানিক নিয়ে। রূপকথা-উপকথারা মনের ভিতরে জন্ম নিয়েই যাচ্ছে। কোথায় সেই মালোপাড়া, তা বাগেরহাট না কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কোথায়? অনিমেষ ঘরের ভিতরে ফিরল জানালা থেকে। রের্কড থেমেছে। তাদের আর নড়ন-চড়ন নেই। গান যেমন তিতিরকে ঘুম পাড়ায়, তেমনি সুরের দোলায় দুলতে দুলতে দুই যমজ ঘুমিয়েছে।

অনিমেষ পাশের ঘরে গেল। মা মেয়ে ঘুমিয়ে। না, তিতলি জেগে। বাবাকে দেখে বলল, কী সুন্দর গান শোনাও তুমি বাবা, সব শান্ত হয়ে যায়।

শুনছিলি ?

হ্যাঁ বাবা, আর গান শুনতে শুনতে কী যে হয়ে যায় ! বিড়বিড় করে তিতলি।

কী হয় ?

তিতলি বলে, খুব আনন্দ হয়, গা এলিয়ে আসে সুখে, মনে হয় সবাই ঘুমিয়ে পড়ছে।

কেমন ঘুমরে তিতলিমা?

তিতলি বলে, সেই অনেক পথ যদি তুমি হেঁটে আস রোদ্দুরে, সেই সারাদিন যদি তুমি কাজ করে করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড় গাছের ছায়ায়, তেমনি।

তুই তো ঘুমোস নি।

তিতলি বলে, না আমি কেন ঘুমোব বাবা, যারা অনেক পথ পাড়ি দিয়েছে সমুদ্রে, তারা, তারা ঘুমিয়ে পড়েছে, কত সমুদ্র, কত রোদ কত বর্ষা কত নোনা হাওয়া তাদের উপর দিয়ে গেছে বাবা, জন্মের পথ কি সরল পথ বাবা, সমুদ্র তো দিকহীন বাবা, তারা সমুদ্র পথের ক্লান্তি ভুলেছে, ঘুমিয়েছে।

অবাক হয়ে যায় অনিমেষ তার মেয়ের কথা শুনে, কবিতার এক একটি চরণ উচ্চারণ করছে যেন তিতলি, সে মুগ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করে, এখন টের পাস?

তখন সুদীপ্তা পাশ ফিরে বলে, কেন পাবে না, তিন মাস হয়ে গেল।

এখন ভাদ্র মাস। এবার বর্ষা তেমন হচ্ছে না। মনে হয় আশ্বিনে ভাসাবে। অনিমেষ বলল, আমি সব ভোরে গান শোনাব ওদের।

সুদীপ্তা বলে, আর উপায় নেই, আমার ঘুম গেল, বাপ মেয়ে দুজনে জোট বেঁধেছে।

তিতলি বলে, মা গো সত্যি, গান বাজলে ওরা খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়ে, মা তুমি নাইয়র জানো, নদীর ধারে বাপের বাড়ি নদীর ধারে শ্বশুরবাড়ি।

জানি না, আমাদের বর্ধমানে তো ওই দামোদর, সারাবছর শুকনো, ব্যারেজের দিকে মুখ করে ঘুমিয়ে থাকে, কবে জল আসবে।

তিতলি বলে, আমি যেন মা সেই মালোপাড়ার মেয়ে।

এই তুই চুপ কর তো, ও সব গাল-গল্প আমি বিশ্বাস করি না, মানুষের জন্ম একটা বায়োলজিকাল প্রসেস, তোকে কী যে শুনিয়েছে সেই চামেলীদি, ওসব মাথা থেকে সরা।

অনিমেষের মনে হল সে যাবে। কোথায় যাবে, বাগেরহাট, না ব্রাহ্মণবাড়িয়া ? বাংলাদেশে গিয়ে সে খবর আনবে যমজের গ্রামের। কিন্তু কতদিন ধরে বাংলাদেশ অশান্ত হয়ে আছে। যাবে কী করে ? রাজাকারদের ফাঁসির দাবীতে ঢাকার শাহবাগ চত্বরে ধর্না চলছে। আর তাতে খুন হয়ে যাচ্ছে আন্দোলনরত যুবক-যুবতীদের কেউ কেউ। পাবনা,

খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরে, রংপুরে সংখ্যালঘু বসতিতে মৌলবাদী আর পাকিস্তানপন্থীরা আগুন দিচ্ছে, খুন করছে। ভাল মানুষেরা এসে আগুন নেভাচ্ছে।

সুদীপ্তা খুব যুক্তিবাদী। সে মিউজিক থেরাপিতে কিছু বলে না, কিন্তু সেই সব গল্পে বিশ্বাস করে না। শুনতেই চায় না। তাই তো স্বাভাবিক। অনিমেষ বলল, ঘুমো তিতলি, আমি শিবরাম চক্রর্বতীর সমগ্র নিয়ে আসব, তুই পড়বি আর ছোটবেলায় ফিরে যাবি, হাসবি, খুব হাসবি, তোর মাকেও একটুখানি হাসতে দিবি, বুঝলি।

তিতলি বলল, বাবা অভি কাল মেসেজ করেছে, ও সেকটর ফাইভে আসছে নভেম্বরে।

তাহলে আন্দামানকে বিদায়।

তিতলি হাসে, মার্চের পর যাব একবার, চামেলীদি বলেছে না নাইয়রে যেতে।

উফ, কী এক নাইয়র শিখে এলি তুই তিতলি, তুই কী তিতাস আর মেঘনার মেয়ে ?

তিতলি খিলখিল করে গাল ভরে হাসে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে অনিমেষ। কে হাসছে, তিতলি নাকি তিতলির ভিতরে জন্ম নেওয়া তাদের দুজনের কেউ? কে তাকিয়ে আছে, তিতলি না তিতলির ভিতরের ওরা। এখন ওরা হাসতে শিখেছে, এমনি হাসে। এখন ওরা দুলতে শিখেছে, এমনি দোলে। তিতলি এমন অকারণে তো হাসত না ? অনিমেষের মনে হয়, হ্যাঁ ওরা। ওদের কেউ হাসছে এমন। কেউ জানে না, জানে সে আর তিতলি। বাপ আর মেয়ে। কিন্তু তিতলি জানে না, তার বাবা টের পাচ্ছে সব। অনিমেষ বলে ওঠে, হাস দেখি মা, আবার হাস।

এই তো, বললে হাসা যায় নাকি? খিলখিল করে হেসে ওঠে তিতলি।

আচ্ছা আবার একবার।

আবার, এত হাসা যায়। বলতে বলতে হাসছে তিতলি। হাসি যেন তার শরীরের অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে আসছে গলগল করে।

অনিমেষ দেখল চাঁদের হাসি। ঘরের বাতাসে যেন সুগন্ধ ভেসে বেড়াতে লাগল। অনিমেষ বলল, হয়েছে হয়েছে, খুব হাসি হয়েছে।

তিতলি আবার হাসে। মুখ টিপে হাসে। অনিমেষ বলে, ফোকলা হাসির পাল্লা দি।

সুদীপ্তা অবাক হয়ে বাপ-মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনিমেষ কার সঙ্গে কথা বলছে, কোলের শিশু। তিতলি যখন ছোট ছিল, সবে তার একটি দুটি দাঁত হয়েছে কি হয় নি, কথা বলত অনিমেষ তার সঙ্গে এমন করে। সেই তিতলির মুখে শুধু খিলখিল হাসি ছিল, বোল ফোটে নি। এখন যেন ঠিক তেমনি করে হাসে তাদের মেয়ে। মা হতে গিয়ে এত আনন্দ ! আনন্দে সুদীপ্তার চোখে জল এসে গেল। সে বলল, একবার জমিলামাসির খোঁজ কর না বস্তিতে গিয়ে, বুড়ি খুব খুশি হবে, এই আনন্দ তো বুড়িরও প্রাপ্য।

১২

এই বস্তি খুব বড়। ট্রাম লাইনের ওপার থেকে আরম্ভ হয়ে একেবারে উল্টোডাঙার কাছাকাছি রেললাইনে গিয়ে থেমেছে। রেললাইনে আগে শুধু গুডস ট্রেন চলত, এখন কলকাতা স্টেশন চালু হওয়ায় অনেক দূরপাল্লার গাড়ি যায়, দমদম থেকে বনগাঁ প্রিন্সেপ ঘাটের গাড়ি আসে। চক্ররেল আসে। তবে এইটুকুতে খুব শ্লথ সেই সব গাড়ির গতি। আগে এই বসতিতে কয়েকবার এসেছে অনিমেষ। এখানে একটি ওষুধের দোকান আছে, সমস্ত রাত খোলা থাকে। একবার তিতলির খুব জ্বর, তারা নিজেদের মতো করে প্যারাসিটামল দিয়েছিল, জ্বর ঘন ঘন ফিরে আসছিল। সূযাস্তের পর রাতে এমনিতেই অসুখ বাড়ে। তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। ডাক্তার বন্ধুকে ফোন করতে সে প্যারাসিটামলের মাত্রা বাড়িয়ে অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করল। তখন রাত হয়েছে অনেক, এগারটা পার। সমস্ত পাড়া নিঃঝুম। সময়টা পুজোর পর। নভেম্বর। তখন এমনিই সব ঝিমিয়ে থাকে। হিম পড়তে শুরু করেছিল সন্ধ্যা থেকেই। সে একা একা এসেছিল এখানে। এসে দ্যাখে অত রাতেও মহল্লায় মহল্লায় লোক। মসজিদে এশার নমাজ পড়ে লোকজন শেষ প্রস্ত গুলতানি মারছে এখানে ওখানে। মিঠাইয়ের দোকান, স্টেশনারি দোকান খোলা। বস্তির ভিতরে একটি খোলা জায়গা আছে। বেশ বড়। আগে ওখানে বোধ হয় ইদের নমাজ পড়া হতো। এখন তো হয় বাইরে, বড় রাস্তার উপরে। এখানে ধরে না। কিন্তু ছোট ছোট সভা হয়। অনিমেষের মনে পড়ে বাবরি মসজিদ ভাঙার পর এখানে এসে তারা সভা করেছিল। কতরকম কত মানুষ। সব ছোটখাট কাজ করে, ব্যবসা করে, হকারি করে। এরই ভিতরে বড় তিনতলা বাড়িও হয়েছে। মস্ত এলাকা, অনেক রাস্তা আছে বেরোনর। আচমকা অনিমেষের মনে পড়ে যায় ইঁদুরের গর্তের কথা। সে এসেছে সেই ইঁদুরের গর্তের একটি রাস্তা দিয়ে জমিলা মাসির খোঁজ করতে। সে কাজ ছেড়েছে তাও বছর দশ আগে। বুড়ি হয়ে গিয়ে আর পারছিল না। ঠিক ছিল তিতলির বিয়ের সময় তাকে ডেকে আনবে। তিতলি তো তার কোলে মানুষ হয়েছে। কিন্তু তখন আসা হয় নি তালেগোলে। সময় পায় নি অনিমেষ। জমিলা শবে বরাতের রাতের কথা বলেছিল মাসিই। সে জানত না। মাসি তিতলির জন্মের আগে থেকেই তার ঘরে সকালে এসে রাতে যেত। দুপুরে খেত তার কাছে। রাতে রুটি তরকারি সঙ্গে করে ফিরত। যে রাতে জন্মাল তিতলি, সেই রাতে সবাই জেগেছিল এই বসতিতে। তারাও প্রায় জেগেছিল আর,জি,কর হাসপাতালে। পরদিন শবে বরাতের রুটি হালুয়া হাতে কাজে এসে মধ্যরাতে তিতলির জন্মের কথা শুনে তার মুখে কী হাসি। বলল, বাবু, তুমার বাচ্চা আল্লার রহমতে ভাল থাকবে, আল্লা ওর ভাগ্য লিখে দিয়েছে, আল্লা ওকে নিয়ে এসেছে জগতে, নাও হালুয়া নাও।

দিনট পুণ্যের। শবে বরাতের রাতে পৃথিবীর সব মানুষের ভাগ্য লেখা হয় সামনের একটি বছরের জন্য। মুসলমানদের বিশ্বাস এই। তাতে অনিমেষের অসুবিধে নেই। বরং ভাল হয়েছে তিতলির যে তা সে দেখতে পাচ্ছে। তার র্অথ প্রতিটি শবে বরাতের রাতে,

প্রতিটি জন্মদিনে তিতলির ভাগ্যে লেখা হয় আলো। সুরভি আর সৌন্দয। জমিলা মাসির কথায় সে জিজ্ঞেস করেছিল, কী লিখেছেন আল্লাহ?

জমিলা হাসি মুখে বলেছিল, নূর।

নূর মানে র্স্বগীয় আলো, অনিমেষ বলেছিল।

জমিলা মাসি বলেছিল, খুশবু, গোলাপের খুশবু।

অবাক হয়ে গিয়েছিল অনিমেষ। ভাগ্যে আলো আর সুরভি লিখে দিয়ে গেছে জমিলার ভগবান। অনিমেষ তখন আচমকা জিজ্ঞেস করেছিল, আর, আর কিছু নয় মাসি?

জমিলা বলেছিল, তার কী শেষ আছে বাবু, বেটির কপালে রূপ লিখে গেছে আল্লা।

তাই-ই তো। তিতলি খুব স্নিগ্ধ। ওর সামনে দাঁড়ালে মন ভালো হয়ে যায়। তার মনে জমিলা মাসির কথাটি গভীর রেখাপাত করেছিল। সে তেমন ঈশ্বর বিশ্বাসী নয়। কিন্তু তার সন্তান জন্মের সঙ্গে এমন ঘটনা জুড়ে গিয়েছিল যে আজও মনে রেখেছে। ওইদিন তালিকা করা হয় পৃথিবীতে কারা কারা আসবে। মানুষের জন্মের ছাড়পত্র। এই মহাবিশ্বে তো তিনি ছাড়া একটি তৃণের জন্ম দিতেও পারে না কেউ। মৃত্যুও তাই। সেই রাতে আগামী একবছরে কারা কারা ফিরে যাবে আপন কুলায়, তার তালিকাও হয়। জন্ম মৃত্যু, জীবন থেমে থাকে না কখনো। তিতলি জন্মেছিল, তিতলি এবার জন্ম দেবে। সমস্তটা কত সুন্দর। এই সুন্দর জীবনে জমিলা মাসির দান আছে। জমিলা মাসি যে কথা বলেছিল, তা কি আর কখনো শুনেছে সে ? তার ঈশ্বর লেখেন এমন? হ্যাঁ, ঈশ্বরই লিখতে পারেন এমন। তিনি তাঁর ঐশ্বরিক কলমে আলো লেখেন, সুরভি লেখেন, লেখেন রূপ। সৌন্দয। নূর তাঁর অক্ষর, খুশবু তাঁর অক্ষর, অক্ষর হলো রূপ।

অনিমেষ ভাদ্রের এই সকালে জমিলার খোঁজে ঢুকে পড়েছে বস্তিতে। আকাশে গুমোট মেঘ। সুগন্ধি সেই হালুয়ার কথা আচমকা মনে পড়ে গেল তার। তখন মা বেঁচে। মা একটা নতুন কাপড় দিয়েছিল জমিলা মাসিকে। এক হাড়ি রসগোল্লা আর পান সুপারী। কিন্তু সে এখন যাবে কোথায়? অনেক দিন আগে এসেছিল একবার খোঁজ নিতে। মাসি তখন আসছিল না বেশ কয়েকদিন। খুঁজে খুঁজে এসে দ্যাখে মাসি অসুস্থ। বাড়িটা ছিল মসজিদ পেরিয়ে। অনিমেষ মসজিদের কাছে সেই খোলা চত্বরে এসে দাঁড়ায়। যাবে কোথায়, কোন রাস্তায়। আগে মসজিদের ডান দিক না বাঁ দিক , কোন দিক দিয়ে গিয়েছিল মনে পড়ছে না। হ্যাঁ, একটা ছোট ফলের দোকান ছিল। এখন কত ফলের দোকান দুই দিকেই। সে ফলের দোকানে গিয়েই জিজ্ঞেস করে, জমিলা বিবি, বুড়ি মাসি, আগে কাজ করত, বয়স হয়ে গেছে, চেন ভাই, কোথায় থাকে বলতে পার?

জমিলা তো অনেক আছে সার, উমর কত হবে, র্কতার নাম কী?

তা তো জানি না, র্কতা মরে গিয়েছিল, দুটো ছেলে একটা মেয়ে।

বেটাদের উমর কত, নাম কী আছে?

মাথা নাড়ে অনিমেষ, কিছুই জানে না। এই মহল্লায় কত লোক, কত খোলার চালের বাড়ি গিসগিস করছে। গায়ে গায়ে লেগে আছে। এর ভিতরে কোথায় খুঁজবে সে জমিলা মাসিকে। সে তবু কী মনে হল, বলল, এক বেটার নাম জলিল। আন্দাজেই বলে দিল কেন তা অনিমেষ জানে না।

আব্দুল জলিল?

হ্যাঁ। নিশ্চিত হয়েই যেন বলল অনিমেষ।

ফলওয়ালা লোকটি রোগা। কালো। তার মাথার চুল কাঁচাপাকা, গোঁফ নেই। মাথাটা লম্বা। থুতনিতে আড়াআড়ি একটা কাটা দাগ। এক ইঞ্চির মতো ক্ষত। চোখদুটি ছোট কিন্তু তীব্র। গায়ে একটি হাওয়াই শার্ট আর লুঙ্গি। বলল, আব্দুল জলিল তো আমার বাড়ির পাশে থাকে একজন, তার মা থাকে রাজাবাজার।

না না এখানে থাকে, আমি মাস ছয় আগে তাকে দেখেছি।

কোথায় দেখেছেন?

বড় রাস্তায়।

বাস টপিজে?

না না, বাজারে। অনিমেষ লোকটার ফাঁদে পা দিল না। যদি বলত স্টপেজে তাহলে ফলওয়ালা সাদেক (পরে সে তার নাম জিজ্ঞেস করে জেনেছিল, সে সাদেক) বলত, আব্দুল জলিলের মা এসে আবার ফিরে যাচ্ছিল রাজাবাজার। এবার ফলওয়ালা জিজ্ঞেস করল, যমজ বেটা, লালু কালু ?

কী? চমকে ওঠে অনিমেষ, জিজ্ঞেস করে, তার মানে?

বলছি যমজ বেটা ছিল কি, এ হাসে তো ও কাঁদে।

তুমি কী করে জানলে?

হামি তো দেখেছি, লেকিন সে মাউসির উমর এখন পঁচিশ।

না না তা হবে না।

ওই দোনোর একজন আব্দুল জলিল, আর একজন আব্দুল খলিল, জলিল খলিল, লালু কালু বলে ডাকা করা হয়। বলে সাদেক জিজ্ঞেস করল, কত উমর হবে মৌসির?

সত্তর শুনে ফলওয়ালা জিজ্ঞেস করে, ধলাবিবি?

হ্যাঁ ধলা।

ছোটপানা ?

হ্যাঁ ছোটখাটো।

আচ্ছা, পেয়ে যাবে, লেকিন সে দাদি কি জমিলা হবে?

হবে তো। বলে অনিমেষ। সে যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। জমিলা মাসি আধ ময়লা রঙের ছিল। খুব বেঁটে ছিল না, মাঝারি হাইট। তার যদি যমজ ছেলে থাকত, সে জানত।

কিন্তু না জানতেও পারে সে, হয় তো সুদীপ্তা জানে। না, তাহলে সুদীপ্তা বলত তিতলির যমজের খবর জেনে। তিতলি বড় হয়েছে জমিলা মাসির কাছে। তিতলিও জানত তাহলে। অবশ্য অনিমেষের মনে হচ্ছে কোনো একজনের কাছে পৌঁছলে তার সূত্র ধরে তাদের জমিলা মাসির কাছে সে পৌঁছতে পারবে। সে কিছু না কিছু বলবে এই খবরে। সেই সাতাশ বছর আগে যেদিন তারা সন্তান পেয়েছিল, সেদিন ছিল হিজরি সনের শাবান মাসের পনের তারিখ। ঐ তারিখেই শবে বরাত হয়। শবে হলো রাত। আরবি ভাষা। বরাত তো ভাগ্য। সেই পবিত্র রাতের ভাগ্য লিখনের কথা পরে তাকে জেনে নিতে হয়েছিল। আর এখন কী হতে পারে? এইটি হিজরি কোন সন। আর মাসই বা কী? সে কাদেরকে জিজ্ঞেস করল, শবে বরাত কবে?

অবাক হয়ে গেল সাদেক, জিজ্ঞেস করল, কিঁউ?

এমনি জিজ্ঞেস করছি।

হয়ে গেছে বাবু, শবে বরাতে এলে তোমার মাউসিকে দেখতে পেতে।

কী করে ? অনিমেষ জিজ্ঞেস করে। এর ভিতরে অনিমেষ খেয়াল করে তার দোকানে কোনো খদ্দের নেই এই আধঘন্টা সময়েও। খদ্দের হবে কেন, আধ পচা শুকনো কিছু আপেল, পেয়ারা, ফ্যাকাশে বাদামি মাছি ভনভনে খেজুর নিয়ে সে বসে আছে। সাদেক বলল, হামি দুকান বন্ধ করে দিচ্ছি বাবু, চল, গুনে দেখি।

গুনে দেখবে মানে?

আমি জানি, এক থালা পানি লিব, তার ভিতরে এক রুপিয়ার কয়েন দিব আর হলুদ, হয়ে যাবে, আমি গুনতে পারি।

কী গুনতে পার ?

পানি দপ্পনে দেখা যাবে তুমার জমিলা আছে কী নেই।

নেই মানে?

মাটি নিতে পারে তো।

মাটি নেবে?

কে জানে কী হয়েছে, বেঁচে থাকলে দেখা যাবে দপ্পনে, তুমিও দেখতে পাবে।

এরপর সে তার আধশুকনো ফলের উপর ময়লা প্লাস্টিক বিছিয়ে ঢেকে দিল। ঝুপ করে নেমে এল মাচা থেকে, বলল, পঁচাশ লাগবে গুনতে।

অনিমেষ বলল, দেব।

হাঁ দিবে, আগে থেকে কনট্যাক করে নেওয়া ভালো, না হলে পরে কিচাইন হয়, মহল্লার লোক আমাকে দুষে।

তারপর অনিমেষের এক জটিল যাত্রা শুরু হলো। এখানে এত মানুষ থাকে আর এত মানুষ পথে, দোকানপাটে, খোলা জায়গায় বসে থাকে বেখেয়ালি হয়ে যে মনে হয়

কোনো সভা আছে বা সভা ভেঙেছে এখনই। আসলে ঘরে জায়গা কম। গরমে সকলে বাইরেই কাটায় রাতে, সকালেও। সম্ভব হলে সমস্তদিন। তাই দুপুর এলেও এমন গমগমে হয়ে থাকে এই সব চত্বর। বাচ্চারা সকাল থেকেই খেলতে আরম্ভ করেছে। ইস্কুলের সময় বই খাতা নিয়ে কেউ কেউ ছুটবে, অনেকেই ছুটবে না। অনিমেষ অনুসরণ করছে সাদেক মহম্মদকে। আজ রবিবার, কিন্তু রবিবারের আলস্য কোথাও নেই। কাজকম্মো শুরু হয়ে গেছে। অনিমেষকে যেন মিনিট দশ গোলকধাঁধায় ঘোরায় সে। এ গলি ও গলি করে করে, সেই কার্জন পার্কের ইঁদুরের গর্তের মতো অনেক মুখ পার করে একটি ঘরের সামনে দাঁড়ায় সে। তালা খোলে দরজার। ভুস করে খানিকটা অন্ধকার বাইরে বেরিয়ে মিলিয়ে যায়। সাদেক বলে, হামার ফেমিলির কেউ নেই, বিবি ছিল, গেল সালে মাটি নিল, বড় বিমারি হয়েছিল, আর,জি, করে দু'মাস ছিল, আমি বুঝতে পেরেছিলাম বিবি থাকবে না।

ছেলেপুলে?

সাদেক ঘরে একটা কুপি জ্বালায়, বলে, কারেন্ট নাই, কাট দিয়া, এক বেটা, দুবাই চলে গেছে চকর হয়ে, হামি বহুত মানা করলাম, শুনল না। বলতে বলতে নিচু হয়ে সে ছোট চৌকির তলা থেকে বের করে আনে একটি কানাউচু থালা। বের করতে করতে বলে, আর এক বেটা গেছে সুরাট, রাজমিস্ত্রি, মেয়ের শাদি হয়েছে, সে চলে গেছে বাংলাদেশ, হামি পানিতে দেখি সব বেঁচে আছে, দুবাই সুরাট আর সিলেটে, মেয়ের ভিটার কাছে একটা গাঙ আছে, বহুত পানি, সুরমা নদী, ওর মরদ ওকে খুব পিটায় আবার যত্নও করে। বলতে বলতে হে হে করে হাসে সাদেক। হাসতে হাসতে ওর গলা জড়িয়ে যায়। খুকখুক করে সে হাসতে থাকে। কিন্তু হাসির ভিতরে এমন কিছু টের পাচ্ছিল অনিমেষ যে কথা বলতে পারছিল না। তবু কোনোরকমে জিজ্ঞেস করে, দেখতে পাও?

হাঁ বাবু। বলে সে গেলাসে জল গড়িয়ে নেয় ঘরের কোনের কলসি থেকে। থালা সেট করে চৌকির উপর। সমস্ত ঘরে একটা গুমো গন্ধ। বাতাস চলাচল করতে পারে না দরজা বন্ধ করলে। কুলকুল করে ঘামছে অনিমেষ। সে কেন এলো এর সঙ্গে তা বুঝতে পারে না। থালায় জল ঢেলে তার ভিতরে মেশানর জন্য চৌকির তলা থেকে বের করে একটা ছোট্ট কৌটো। তার ভিতরে হলুদগুঁড়ো। জলে এক টিপ গুঁড়ো হলুদ দেয় সাদেক। জল ঘুলিয়ে দিয়ে একহাতে কুপি ধরে হাঁ করে জলের দিকে চেয়ে থাকে। জমিলা তো, জমিলা বিবি? তুমি দেখ বাবু। দেখতে পাবে। অনিমেষের তখন মনে পড়ে যায় সেই জমিলামাসির কথা, তখন সে চল্লিশ পার। আধময়লা, গোলগাল এক রমনী। মাথায় সবসময় কাপড়। মুখে সবসময় হাসি। হাসিতে নূর আর খুশবু, খুশবু আর রূপ। অন্ধকারে অনিমেষ জল দেখতে পায় কিনা বুঝতে পারে না। তাকে সাদেক বলে, ভাব বাবু, খুব করে ভাব, মাউসির কথা ভাব, দেখতে পাবে, দেখছ তুমি?

সাদেক বিড়ি ধরিয়েছে। ঘরে বিড়ির ধোঁয়া একজায়গায় জমে যাচ্ছে। অনিমেষের মনে পড়ে তিতলিকে নিয়ে জমিলার আদর। মেয়েকে বকাবকির উপায় ছিল না। মেয়ে সমস্তদিন জমিলার কাছে থাকত। জমিলা তাকে আরব দেশের রূপকথা শোনাত। আলাদিন আর আশ্চয প্রদীপ। হাতেম তাই। তার গায়ে হাত দিল সাদেক, বলল, না দেখলে বুঝা যাবে সে মাটি নিয়েছে।

না না দেখছি। অনিমেষ বলে।

দেখছ, সাচ?

সাচ।

সাদেক হতবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। অনিমেষ তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে লাফ দিয়ে। একটা কীট তার পায়ের পাতায় উঠেছিল। আরশোলা হতে পারে। বিছেও। তার পিছু পিছু সাদেকও বেরিয়ে আসে। বিহ্বল চোখে সে অনিমেষকে আবার জিজ্ঞেস করে, কী দেখলে বাবু?

বাচ্চা দোলাচ্ছে বুড়ি।

সাচ ?

সাচ। উত্তর দিতে দিতে অনিমেষ মানি ব্যাগ থেকে টাকা বের করে পঞ্চাশ কেন একশো টাকার নোট ধরিয়ে দিল সাদেকের হাতে। আর তা নিয়ে সেই গণৎকার এক ছুটে পাশের গলির ভিতরে ঢুকে যায়। অনিমেষ আর দাঁড়ায় না। ফিরে আসে। সে দেখেছে জমিলাকে তিতলি কোলে। না দেখলে যে জমিলা মাটির তলায় গেছে এই ঘোষণা করত সাদেক। বাড়ি ফিরে সে তিতলি আর সুদীপ্তাকে বলল, নেই, পার্ক সারকাস বা রাজাবাজারে চলে গেছে, সিলেট বা নলহাটিতেও হতে পারে। তবে বেঁচে আছে সে। তা শুনে সুদীপ্তা কপালে জোড় হাত দিল, বেঁচে আছে যখন সে আসবেই একদিন ঠিক।

১৩

ভাদ্র গিয়ে আশ্বিন। আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি। ঢাক বেজে উঠল খালেবিলে, প্রান্তরে নদীঘাটে। নাইওরে মা এলেন চার সন্তান নিয়ে। যেন দুই জোড়া, লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্তিক গণেশ, ইলি বিলি, হেতাল। তিতলির এখন সাড়ে চার মাস। মানে চার পূর্ণ হয়ে পাঁচ চলছে। শরীর দেখে ধরা যায় মা হতে চলেছে। মুখ-চোখে এসেছে স্নিগ্ধ ভাব। তিতলির সামনে আস্তাবলে জন্মান শিশু আর মা মেরির ছবি দেওয়াল জুড়ে। তিতলির সামনে বাল-গোপালের ছবি। তিতলির সামনে যমজ দুই শিশুর ছবি। তিতলি গেছে শ্বশুর বাড়ি। লম্বা ছুটি নিয়ে অভি এসেছে। আন্দামানের পাট চুকে যাচ্ছে। এই সময় একদিন তিতলির কাছে ফোন, হ্যাঁরে, মালোপাড়ার বউ, কেমন আছিস তুই মা ?

তখন অপরাহ্ণ বেলা। অফুরান উল্লাসের পুজো শেষ হয়ে সমস্ত শহর যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। সবদিকে মূহ্যমানতা। তিতলি বসে গান শুনছিল শচীনদেবের।

কে যাসরে ভাটি গাঙ বাইয়া, আমার ভাইধনরে কইও নাইওর নিতে বইয়া...।

ফোন ধরে তিতলি বলে ওঠে, কী গো চামেলীদি, আমাকে ভুলে যাও নি তাহলে?

ইস, যমজের মা, মালোপাড়ার বউ, জোড়া ঠাকুরের ফুল আছে তো?

আছে গো আছে।

শোন, আমি যাব তোরে দেখতি, রাজবল্লভপাড়া কোন জায়গা, ঠিকানাটা বল।

তুমি কি সাগর পেরিয়ে এসেছ ?

চামেলী বলে, হ্যাঁ, আসতি হলো খবর পেয়ে, আমি তোদের মেন ল্যান্ডে এয়েছি।

ওমা তাই, কোথায় গো, কলকাতা?

না, মসলন্দপুর।

এখন কি মতুয়া উৎসব?

না রে না, আমার এক পিসতুতো দিদি আছে ওপারে, তার ছোটননদ আর ঠাকুরজামাই, দুই মেয়ে নিয়ে এপারে চলে এয়েচে, পিসি বলেচে তাদের দিগলিপুর নিয়ে যেতে, আমি আর তোর দাদাবাবু আলাম তাই, এদিকি থেকি কী করবে বল, তারা গাঁ গেরামের মালো, চাষবাস করে, মাছ মেরে খেত, এদিকি না আছে গাঙ না আছে জমি।

ও, কেন এল তাহলে ?

সে আমি গে বলব খুকি, কবে যাব বল, কালীঘাটে পুজো দেবে ওরা, তারপর যাব।

১৭ তারিখটায় এস না চামেলীদি, ওইদিন আমার চেক-আপ আছে।

আচ্ছা রোববার করে যাবরে, ক'দিন তোরে খুব দেখতি ইচ্ছে হচ্ছে, আমার ছোট বুনের মতো তুই, ভালভাবে হয়ে গেলি বাঁচি, ফাল্গুনে তো?

হ্যাঁ, দিদি, এস, তুমি এলে খুব আনন্দ হবে, দুপুরে তোমরা খাবে। তিতলি বলে।

আচ্ছা, তোর জন্য আমি গুড় মাখানো ছড়া তেঁতুল নিয়ে যাব।

সবাইকে নিয়ে আসবে, ননদ আর ঠাকুর জামাই।

কথা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও খুব আনন্দ লাগছিল তিতলির। মাধবী শুনে বললেন, বাহ, মেয়েটা খুব ভাল, আনন্দে থাকে সবসময়।

তিতলি বলে, কতদিন বাদে ঠাকুরজামাই আর ননদিনীর কথা শুনলাম মা, এসব তো কেউ বলে না এখন।

মাধবী হেসে বললেন, সেই গানটা জানিস তো, বলি ও ননদি আর দু মুঠো চাল ফেলে দে হাঁড়িতে...।

গুনগুন করে ওঠে তিতলি। স্বপ্না চক্রবর্তীর গান তার খুব প্রিয়। ইস চামেলীদি কী সুন্দর মেলাতে পারে নতুন আর পুরোন। ......কী আনন্দের গান গেয়েছিল স্বপ্না চক্রবর্তী,

বলি ও ননদি আর দু মুঠো চাল ফেলে দে হাঁড়িতে, ঠাকুরজামাই এল বাড়িতে,ইস্টিশনের বাবুর মতো মিষ্টি পান খেয়ে...। মাথায় খুব করে গন্ধ তেল মেখে, ঘাড়ে গলায় পাউডার দিয়ে ধুতি আর টেরিকটনের পাঞ্জাবি পরে গায়ে চার্লি সেন্ট ছড়িয়ে ঠাকুর জামাই মিষ্টির হাড়ি হাতে শ্বশুরবাড়ি আসবে পঞ্চাশ বছর আগের পৃথিবী থেকে। বাংলাদেশে সব আছে, সব। হারিয়ে যাওয়া পৃথিবী ঘুমিয়ে আছে ওই দেশে। চামেলীদির পিসতুত দিদির ছোটননদ আর ঠাকুরজামাই-এর জন্যই যেন অপেক্ষা করতে থাকে তিতলি। তিতলি আর মাধবী। মাধবী আর অভিরূপ। রবিবার এসে যায়। দমদম জংশন থেকে মেট্রোয় চেপে শোভাবাজার মেট্রো স্টেশন, সেখানে গিয়ে অভি নিয়ে এল চামেলীকে। শুধু চামেলী, আর কেউ না। ইস্টিশনের বাবুর মতো মিষ্টি পান খেয়ে সেই ঠাকুরজামাই আসে নি। ননদিনীও না। না কেন গো চামেলী, নিয়ে এলে না কেন ?

চামেলী যেন একটু অন্যমনা। বসেছে সোফায়। বলছে, আমার বড় দেখতি ইচ্ছে করল খুকি তোরে, প্রথম পুয়াতি, তোরে নিজির বুন বলে মনে হয়, কতদূরে আছি আমরা, তুই আর যাবি কিনা কেডা জানে।

মাধবী নেই । অসুস্থ বোনের কাছে গেছেন সল্টলেক। সঙ্গে গেছেন সুজনও। ফ্ল্যাটে তিতলি আর অভিরূপ। আর রান্নার মাসি। ভাল আয়োজন করেছিল তিতলি, কিন্তু চামেলী তো একা এসেছে। কেন আসে নি তারা, তাদের বলতে হত তিতলিকে। অনাহুত হয়ে আসবে কেন? কিন্তু অনাহুত তো নয়। তিতলি তো ডেকেছিল। না না তিতলির আমন্ত্রণে কোনো ভূল ছিল না। তারা আসে নি কেন চামেলীদি?

আসে নি, আসতে মন হয় নি রে খুকি।

তিতলি বলে, কেন, আমি বলি নি বলে?

এক কথা বলিস কেন, তারা ভিটে আর দেশ ছেড়ে এয়েচে, মন খারাপ খুব, ঘোর কাটে নি, কানছে।

ও, তা হতে পারে।

এত কালেও আসে নি ওই ফ্যামিলির কেউ, ওই গ্রামের কেউ, এখন এল, আসতে বাধ্য হল খুকি, নঙ্কায় রাবন মলো...।

চুপ করে থাকল তিতলি। চামেলী বলল, আমি ভেবেছিলাম থাকব একটা মাস, এয়েছিলাম আমার মাসতুতো ভাইএর ছেলের অন্নপ্রাশনে, এসে এতে জড়িয়ে গেলাম, উপায় নেই, ওদের রঙ্গত নিয়ে না যেতে পারছি যতক্ষণ, আমার শান্তি নেই, ওরাও থাকতে চায় না এখেনে, গাঙ আর পানি চায়, ওরা জলরে পানিও বলা শুরু করিল, কিন্তু টিকতি পারল না।

অভিরূপ বলে, জল আর পানির কী আর তফাৎ, আমরা ছাড়া সবাই তো পানিই বলে।

কথাটা গ্রাহ্য করে না চামেলী, বলে, নোতন জীবন দিতে হবে ওদের, পালিয়ে এয়েছে তো।

অভিরূপ জিজ্ঞেস করে, খুব অশান্তি চলছে, তাই তো, নেটে দেখছি, রাজাকারের ফাঁসির আদেশের পর খুব মানুষ খুন হচ্ছে, বাস পুড়ছে, এক নাগাড়ে হরতাল।

হ্যাঁ, তাও তো সব জানা যায় না। বলল চামেলী।

অভিরূপ বলল, নেটে জানা যায়, একটা সাইটে লিখেছে, রাতেই তলোয়ার বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়তে, ইসলাম বিরোধীদের খুঁজে খুঁজে নিকেশ করতে, বাড়ি বাড়ি হামলা চালাতে, বাড়িতে যদি পুরুষলোক না থাকে, মেয়েমানুষদের রেপ করে কোতল করতে বলেছে, কিন্তু তারা তো শুধু হিন্দুর কথা বলে নি, বলেছে পাকিস্তান বিরোধীদের কথা, মুসলমানও মরছে কম না, সিভিল ওয়ার চলছে ওদেশে।

থাক থাক। চামেলী বলে, দেশটায় শান্তি হবে না, সেই জন্ম থেকে যুদ্ধ করেই চলেছে তারা, আহা কী ভাগ্য ওদের!

তিতলি শুনতে শুনতে বলে, ওরা এলে ভাল হত, মনের ভার হালকা করে যেত।

খুকি সে ভীষণ ভার, সারাজীবন তার ভার থাকবে, ওরা তো খুন হয়ে যেত, পাকিস্তান আবার ফিরে আসবে এই কথা চাউর করে দিচ্ছে একদল, আবার বলছে লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, আরো কত কী ঘটেছে যে বলার না।

কী ? তিতলি জিজ্ঞেস করে।

থাক খুকি, ওরা কানছে শুধু, কী যে হবে ওই দেশের !

থাক তাহলে। বলল তিতলি। কিন্তু তার মনে হল কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না চামেলীদি। না বলবে তো সেই বা শুনতে চাইবে কেন?

যাকগে, আমি এই আচার এনিছি তেঁতুলের, আর ফুল বড়ি, আমসত্ব এনিছি, গোবরডাঙার মাসি দিয়েছে।

তিতলি বলে, কফি খাও চামেলীদি, আমি স্নান থেকে আসি, অভির সঙ্গে কথা বল, দুপুরে খেতে খেতে গল্প হবে, সারাদিন গল্প হবে, তুমি বরং নাইওরের গল্প শুনিও আবার, কী সুন্দর বলো তুমি চামেলীদি।

তিতলি স্নানে যেতে চামেলী কফির কাপ ঠান্ডা করতে করতে অভিরূপকে বলল, কী বলব বলো, মানুষ কত দয়ামায়াহীন হতে পারে, প্রায় একশো বছরের এক বুড়ো, যে ছিল ওদের মালোবুড়ো, ঠাকুরজামাই-এর দাদাঠাকুর, আবার মুক্তি যোদ্ধাও বটে, ওরা বলে মুক্তিবুড়ো, তারে পুড়িয়ে মেরেছে ঘরের শেকল তুলে দিয়ে।

কী বলছেন দিদি ? ভর্য়াত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে অভিরূপ।

ওরা আতঙ্কে পালিয়ে এসেছে, বলছে মুক্তিবুড়ো, মালোবুড়োর বংশ নাশ করবে, গাঙের পানি লাল করে দিবে, যেমন করেছিল মুজিবের, তেমনি।

তারপর?

চামেলী বলল, জ্যান্ত পুড়ে মরেছে বুড়ো, অপেক্ষা করছিল রাজাকারের শাস্তির জন্য, বলত ফাঁসি হলে সে নিশ্চিন্তে নাও ভাসাতি পারবে গাঙে, যেদিন রায় হলো পরদিন দিনমানে রাজাকারের ছাবালরা এসে গাঁ ঘিরে ফেলে জ্বালিয়ে দিল।

ওরা আটকাতে পারল না? অভিরূপ জিজ্ঞেস করে।

না, সবাই মিসিন নিয়ে এয়েছিল, ওদের কাজ হলো গে সুযোগ পেলিই লুটপাট করা, মানুষ মারায় ওদের ক্লান্তি নেই, পুলিশ ওদের কিছু বলে না।

ইসস ! অভিরূপ বলে, ওদেশের মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয় নি।

কী জানি, ওদের ফেমিলিটা মুক্তি ফেমিলি, যমজ বুড়োর একজন সেই সময় মরেচে, বাকি এই একজন ছিল বট বিরিক্ষের মতো, তারে জ্যান্ত পুড়ায়ে মারল, কী চিৎকার করেছিল বুড়ো মরার আগে, জয় বাংলা বাংলা করতে করতে বাঁচল না।

থাক চামেলীদি, আর বলবেন না।

ওরা বাঁশবনের অন্ধকারে গে লুকোয়ছিল সমস্তদিন, না হলে ওদেরও জ্বালাই দিতরে। বলতে বলতে চামেলীর চোখ ছলছল করতে লাগল।

এরপর আর কী? চামেলীর কথা থেমেই গেল প্রায়। তিতলি এসে বসল স্নানের পর। সে র্গভবতী মা। তার সমস্ত কিছু ধীর হয়েছে। সে এসে দেখল চামেলী চোখ মুছল আঁচলের খুট দিয়ে। তাকে রেখে থমথমে মুখে উঠে গেল অভি। সে যাবে স্নানে। তিতলি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী হল চামেলীদি?

কই কিছু না তো।

তুমি কানছিলে?

না না, কাঁদব কেন, এই তারা ভাল আছে তো, চেকাপে কী বলল ডাক্তার?

খুব ভাল আছে চামেলীদি, গ্রোথ ঠিক আছে।

সাড়া দেয় ?

হ্যাঁ গো চামেলীদি, খুব দুষ্টু দুজনায়। বলতে বলতে সুখে গলে গেল তিতলি। তার কথাগুলো যেন শুনতে পাচ্ছে তার ভিতরে খেলে বেড়ান দুইজন। কী যে প্রাণময় হয়ে উঠছে তারা দিনেদিনে। সলিল চৌধুরীর সেই গান, ধিতাং ধিতাং বলে......বাজলেই তারা যেন খেলতে আরম্ভ করে। তাদের একজন নিচে একজন উপরে। মাঝখানে দেওয়াল। দেওয়ালে মুখ দিয়ে যেন একজন অন্যজনের সঙ্গে কথা বলে। তিতলি টের পায় বুঝি সব। সে দশ মাস ধরে এই ভাবে মা হয়ে উঠছে। ঝিলমিল আর ধিতাঙের। শচীনদেবের গান, ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলের জলে ঢেউ খেলিয়া যায়......... তাতেও ওরা দুলতে থাকে। দুলতে দুলতে স্থির হয়ে যেতে থাকে, মানে দুলতে দুলতে ঘুমিয়ে পড়ে। একটা গান জাগায় আর একটা গান ঘুম পাড়ায়।

শুনতে শুনতে চামেলী তার গায়ে স্নেহের হাত বুলায়, বলে, তুই আমার আজ্জন্মের বুন ছিলিসরে তিতলি, তুই আজ্জন্মে বাগেরহাটে ছিলিস, তোরে দেখে তাই মনে হয়। বলতে বলতে চোখ মোছে চামেলী, বলে, তোর ভিতরে মালোবুড়ো, ইলি বিলি, না হয় হেতাল বেতাল দেছে ওদের, ফাগুনে পারি তো আসব আমি।

তুমি ভাল আছ তো চামেলীদি? তিতলির মনে হল এই কথাটা তার জিজ্ঞেস করা দরকার। চামেলীদি তখন চোখ মুছছিল কেন? এখনই বা কেন ছলছল করছে চামেলীদির চোখ। তার কথায় চামেলী তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ভাল আছিরে ভাল আছি।

আন্দামানে খুব যেতি ইচ্ছে হয়। বলে তিতলি।

যাবি যাবি, ওদের নিয়ে যাবি। চামেলী বলে।

চম্পাদি ভাল আছে ?

খুব আছে, মেজিস্টেট, লঞ্চ থেকি নামলিই ভেঁপু বাজে। বলে চামেলী হাসতে চায়। পাঁরে না। তিতলি বলে, দুই বোনে আসতে না হয় একসঙ্গে, দুই যমজে।

আমার দরকার পড়ল তাই আসতি হলো। চামেলী বলে এদিকটা ভাল, শীত পড়ে, বিস্টি নেই, ওখেনে বিস্টির আর শেষ নেইরে।

চামেলী বলতে বলতে থামে। কথা সে খুঁজে পাচ্ছিল না। আর তিতলিরও যেন তাল কেটে যেতে লাগল। চামেলী ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হচ্ছে। এরপর দিন গেল দ্রুত। খেয়ে উঠে চামেলী আর থাকতে চাইল না। অদ্ভূত লাগল তিতলির। কী হল চামেলীদি, তোমাকে শিয়ালদা স্টেশনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়ে আসবে অভি, আর একটু থাকো, মা ফিরে আসছে এখনই, আমাকে মেসেজ দিয়েছে।

না রে আমার মন ভাল নেই, মাসীরে বলিস ফাগুনে আসব আমি, এখন ওই ঠাকুরজামাই আর ননদি নিয়ে আমি দিগলিপুর যাব।

সে তো যাবে, কিন্তু এখুনি ফিরবে কেন, কী হয়েছে?

কিছু না, এমনি। চামেলী বলে, যাই রে, তোর হলে আমি ফাগুনে আসব। বলে চামেলী চলেই গেল। তাকে শিয়ালদা পৌঁছে দিতে গেল অভি। দমদম থেকে ট্রেনে ওঠা খুব কষ্টের। একটু বাদে মাধবী ফিরলেন। চামেলীর জন্যই তাড়াতাড়ি আসা। তিনি হতাশ হলেন, এত তাড়াতাড়ি চলে গেল!

হ্যাঁ মা, থাকলই না।

মাধবী হেসে জিজ্ঞেস করলেন, নাইওরের গান শুনলি?

না মা, কী যে হল, চলে গেল।

মাধবী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন তিতলির দিকে। মন খারাপ হয়ে গেল।

১৪

দিনটা কেমন যেন হয়ে গেল। চামেলী চলে যেতে বাইরে রোদ মরে গেল সহসা। সব কিছু মলিন মনে হতে লাগল। তিতলি চুপ করে গেল। যে আনন্দ হয়েছিল, তার বেলুন চুপসে গেল যেন। মন খারাপটা চারিয়ে যেতে লাগল দুপুর থেকে বিকেলে। বিকেল থেকে সন্ধেয়। সন্ধে থেকে রাতে। রাতে অভিকে জিজ্ঞেস করল তিতলি, চামেলীদি চলে গেল কেন আচমকা?

অভি বলল, বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছে তারা একা আছে তাই বোধ হয়।

তিতলি বলল, তারা একা থাকবে কেন, যে বাড়িতে উঠেছে, সেই বাড়ির লোকেরা কি নেই?

অভি কথা ঘুরিয়ে দেয়, বলে, তোমাকে চামেলীদি মালো বউ বলে, তাই না?

আদর করে বলে, কিন্তু এল যদি, হঠাৎ চলে গেল কেন? তিতলি জিজ্ঞেস করে।

তুমি মালো বউ, আমি কি তাহলে মালো ?

মালোই তো, মালো না হলে জোড়া আসে আমার ভিতর ? তিতলি বিড়বিড় করে বলে।

অভি বলে, আমি কি গহীন সমুদ্দুরে মাছ ধরতে যাই?

যাও তো। অভির গলা জড়িয়ে যেন র্নিভরতা নিতে চায় তিতলি।

অভি বলল, তিতাস একটি নদীর নাম পড়েছ তুমি তিতলি?

তিতলি বলে, হ্যাঁ পড়েছি, তুমি ?

অভি বলল, না আমি সিনেমা দেখেছি, সেও তো মালোদের কথা, কই যমজ ছিল না তো সেখানে।

তিতলি বলে, না ছিল না।

তাহলে তোমার চামেলীদি কী বলে?

তিতলি বলে, আহা সে তো ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা জেলা, এ তো বাগেরহাট।

চামেলীদির ঠাম্মা কুমিল্লার মেয়ে ছিল না ? ,

হ্যাঁ, কেন?

অভি বলল, যমজের কথা সব বানানো তোমার চামেলীদির।

কে বলল?

আমার মনে হয়। অভি জবাব দেয়।

তিতলি বলল, মোটেই না।

অভি বলল, ইন্টারনেটে কোথাও তো নেই।

সব কি আছে ইন্টারনেটে?

কেরলের এক গ্রাম আছে, তার তিনদিকে সমুদ্র আর নদী, সেখানে শুধু যমজ জন্মায়, এইটা পেলাম।

সত্যি! তিতলি বিস্মিত।

হ্যাঁ সত্যি। অভি বলে।

কেন গো?

অভি মাথা নাড়ে, তা জানা যায় না, নাইজেরিয়াতেও এমনি এক গ্রাম আছে।

ইস, কেরল তো নদী আর সমুদ্রে ঘেরা। তিতলি বলে, তাহলে তা মালোদের গ্রামই হবে।

মালোদের গ্রাম ! থমকে যায় অভি, ভাবে, তাই তো, হতেও তো পারে। তাই-ই হবে। নদী আর সমুদ্রের ধারেই তো তাদের বসতি হয়। হলো, কিন্তু নাইজেরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ওয়ো প্রদেশের সেই গ্রাম ইগাবো-ওরা ? আদিবাসী ইগাবো-ওরাদের সেই গ্রামে এমন কোনো ঘর নেই, যেখানে যমজ নেই। গ্রাম-প্রধানের বাবা মায়ের ছিল দশ জোড়া যমজ সন্তান। তাঁর তিন জোড়া। সেখানে সমুদ্র নেই মনে হয়। সেখানে কী করে শুধু যমজ জন্মায়? তিতলি শুনতে শুনতে বলে, খোঁজ নিয়ে দ্যাখো, সেখানেও নদী আর সমুদ্র আছে।

অভি চট করে উঠে বসল, থাকবে না কেন, আরব সাগর, আটলান্টিক আর আন্টারটিক ওসান, কেপ অফ গুড হোপ, উত্তমাশা অন্তরীপ, তাই তো, আফ্রিকায় তাই আছে।

তিতলি বলল, সেও তাহলে সমুদ্র কিংবা নদীর ধারের গ্রাম, মালোদের গ্রাম।

হতে পারে। অস্ফূট গলায় বলল অভি।

দুজন থাকলেই গহীন সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া যায়। তিতলি বিড়বিড় করে বলে।

হু, অভি বলল, তাই হবে, কিন্তু মরুভূমি পাড়ি দেয় যখন ?

মরুভূমি আসছে কী করে ? তিতলি জিজ্ঞেস করে।

আসছে না, কিন্তু মরুভূমির দেশে কি টুইন হয় না, রাজস্থানে, থর মরুর দেশে ?

তা আমি কী করে জানব ? তিতলি বলে।

অভি বলল, মালোবুড়োর কাহিনি সত্যি নয়, বানানো গল্প।

হতে পারে, কিন্তু গ্রামটায় ঘরে ঘরে যমজ তা তো সত্যি। বলল তিতলি।

অভি বলল, তিতলি ওই চামেলীদি বানায় সব, আর যা বানায় তা সত্যি মনে করে।

তা আবার হয় নাকি ? তিতলি মাথা নাড়ে।

তাই-ই হয় তিতলি, শোনো, আমাদের এই নতুন অফিসে হরিশঙ্কর মীনা আর শিবশঙ্কর মীনা, দুই ভাই আছে, রাজস্থানী ওয়ারিয়র ট্রাইব, তারা টুইন।

তাই, হেতাল বেতাল ! একদিন আসতে বলো না।

হেতাল বেতাল কারা ?

তিতলি বলল, যমজ দুই ভাই, শুনবে সেই গল্প ?

পরে শুনব, কিন্তু তারা কী করে জন্মাল যমজ হয়ে, দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি আ বাইওলজিকাল রিজন, জেনেটিক ও হতে পারে।

সে কি আমি জানি না গো, কিন্তু মালোবুড়োর গল্পটা কী সুন্দর, তিনিই যমজ দেন পৃথিবীতে !

অভি বলল, তাহলে হরি আর শিব কী করে জন্মাল?

তিতলি চুপ করে থাকে, তারপর বলে, মালোবুড়ো তাদের রাতের অন্ধকারে মরুদ্যান থেকে যাত্রা করিয়ে দিয়েছিল, আকাশে তখন ক্ষীণ এক চাঁদ, শুক্লপক্ষের প্রতিপদ ছিল সেইটা, তারা লুপ্ত হয়ে যাওয়া সরস্বতী নদীর খাত ধরে চলতে আরম্ভ করে।

তারপর ? অভি জিজ্ঞেস করে।

তিতলি বলে, একপক্ষ নাও বাইতে হবে, যেদিন পূর্ণিমা হবে, সেদিন ওরা মাকে পাবে, আমার সোনারাও তেমনি পেয়েছিল।

আশ্চয, তুমি কার কাছে এসব শুনেছ ?

কেন, চামেলীদি তো যেন এই কথাই বলেছিল।

হরিশঙ্করকে আমি কাল বলব।

তিতলি যেন ঘোরের ভিতর থেকে কথা বলে, শোনো, প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা, সরস্বতী নদীতে নাও বেয়েছিল তারা, তখন লুপ্ত নদী আবার স্রোতধারা নিয়ে বয়েছিল, তা না হলে হয় না গো হয় না।

অভি তিতলির মাথায় হাত রাখে, চুলে বিলি কাটে, বলে, তিতলি, তুমি কি কবি, এমন কথা তো আমি ভাবতে পারি নি, কী শোনালে তুমি !

আমি কোনদিন কবিতা লিখিনি অভি, তিতির লেখে।

অভি বলল, হরিশঙ্কর বলে, থর মরুভূমির নিচেই সরস্বতী নদী, তাদের গ্রামের কাছে আরকিওলজিকাল সারভে অফ ইন্ডিয়া খনন করছে, সরস্বতী নদীর খাত আছে নাকি ওখানে, লুপ্ত সভ্যতা, তুমি কী করে জানলে তা ?

ঘরে আবছা নীল অন্ধকার। তিতলি কাত হয়ে শুয়ে আছে। অভির হাত তার মাথায়, তিতলি বলল, আমি একটা বই পড়েছিলাম, তার ভিতরে ছিল সরস্বতী নদী নিয়ে কথা ছিল, মনে পড়ে গেল, দ্যাখো এমন তো হতে পারে নদী মরে গেছে, কিন্তু মালোপাড়া কি মরে যাবে, না মালোবুড়ো, সে সরস্বতী নদীকে বাঁচিয়ে নাও ভাসিয়ে দিয়েছিল দুই ভাইয়ের, যা, মায়ের কাছে যা, গোটা শুক্ল পক্ষ ধরে তারা নাও বাইতে লাগল, পূর্ণিমার রাতে মাকে পেয়ে গেল।

হ্যাঁ। অভি অস্ফূট জবাব দিল, তারপর বলল, ঘুম পাচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়ি, কী সুন্দর তুমি সেই হারিয়ে যাওয়া সরস্বতী নদীকে বাঁচিয়ে তুললে তিতলি, তোমার কোল জুড়ে আসুক তারা।

তিতলি বলে, নদী না বাঁচলে প্রাণের কি জন্ম হয় গো, নদীই প্রাণ, প্রাণ নদী বা সমুদ্রজলে ভেসে থাকে।

অভির চোখে ঘুম এল, সে যেন ঘুমের ভিতর বয়ে যাওয়া জলস্রোতের শব্দ শুনছিল। তিতলি গুনগুন করতে লাগল, আয় ঘুম যায় ঘুম মালো পাড়া দিয়ে.........।

তারপর অভি ঘুমোলে ধিতাং আর ঝিলমিল অন্ধকারে বেরিয়ে আসে। ধিতাং বলে, শুনলি তো, মা কী সুন্দর বলল।

না আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঝিলমিল বলে।

ইস শুনলিনে মরুভূমির নদীর কথা।

ঝিলমিল জিজ্ঞেস করে, মরুভূমি কী ?

তার নিচে নদী থাকে।

নদী কী ?

গাঙের মতো মনে হল। ধিতাং বলে।

ঝিলমিল বলে, মরুভূমি কি গাঙ ?

কে জানে, সরস্বতী জানে। ধিতাং বলে।

সরস্বতী কী? ঝিলমিল জিজ্ঞেস করে।

আমি তার জানি কী, মা আর ওই লোকটা বলছিল তাই শুনলাম।

লোকটা না বাবা। ঝিলমিল বলে, এইটা জানিস না?

জানি তো, বাবা লোকটা বলছিল।

উফ, আবার লোকটা! ঝিলমিল বলে, থাক, এখন কী করব ?

খেলব, বাবা যে ঘুমোল, এই বাবা কে হয় রে?

ঝিলমিল বলে, বাবা তো বাবা হয়, বাবা বাবা বাবা, মা মা মা। বলতে বলতে সে ঝিলমিল হাত ধরে ধিতাঙের। তারপর গান গাইতে থাকে নেচে নেচে, ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলের জলে ঢেউ খেলিয়া যায়......।

অন্ধকারে ঢেউ ওঠে। ঢেউয়ে দুলতে থাকে? তারা। তিতলি সব বুঝি টের পায়, কচি পায়ের শব্দ ওঠে তার চারপাশ ঘিরে। তখন আচমকা ঘুম ভেঙে যায় অভির, সে ডাকে, ঘুমোলে তিতলি ?

না, তুমি ঘুমোও নি?

ভেঙে গেল ঘুম।

কচি পায়ের শব্দ আচমকা থেমে অন্ধকার তখন নিথর। তিতলি হাত রাখে অভির গায়ে। জিজ্ঞেস করে, চামেলীদি এমন করে চলে গেল কেন?

আমি কী করে জানব? অভি বলে।

কাঁদছিল, কী হয়েছে চামেলীদির?

চমকে ওঠে অভি, বলে, না তো, কাঁদে নি তো।

আঁচলে চোখ মুছছিল, তুমি তো তখন বসে। তিতলি বলে।

খুব মন খারাপ। অভি বলল, আমি খেয়াল করিনি।

তোমাকে কী বলছিল চামেলীদি?

কী বলবে, কিছু না। অভি বলে।

আমাকে তখন যা বলল না, তাই বলছিল তোমাকে?

অভি বলল, সে আমি জানি না।

আমি না থাকার সময় তোমাকে কী বলেছে চামেলীদি, আমাকে চেপে গেল কেন ?

কিছু বলে নি তো। অভি কোনো রকমে বলে।

কিছু একটা বলেছে, কী বলেছে বলো না। তিতলি জিজ্ঞেস করে।

ও, আমাদের ব্যাপার না, বাংলাদেশের।

বাংলাদেশের কী গো ? তিতলি জিজ্ঞেস করে, বলে, সব হয়ে যাক ভালোয় ভালোয়, আমরা একবার বাংলাদেশ যাব, সেই বাগেরহাট, মালোপাড়া, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সব দেখে আসব।

ঠিক আছে, এখন ঘুমোও। বলল অভি।

ভৈরব, রূপসা, তিতাস, পদ্মা, মেঘনা নদী দেখে আসব।

অভি চুপ করে থাকে। তিতলি কেন ঘুমায় না আজ, তিতলি ঘুমোও।

তিতলি বলে, মালোপাড়া যাব, মালোবুড়োকে দেখে আসব।

ঠিক আছে। অভি তিতলির মাথায় ধীরে ধীরে চাপড় দেয়।

তিতলি আবার জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে চামেলীদির, বলো না।

থাক এখন, কাল শুনো। অভি নিরস্ত করতে চায় তিতলিকে।

আচমকা চলে গেল, তারপর সব কেমন দুঃখে জড়িয়ে গেল। বিনবিনিয়ে বলে তিতলি, হ্যাঁ গো আমার মন খারাপ হয়ে গেল।

অভি বলল, তুমি ঘুমোও, কিছু হয় নি।

না, চামেলীদির কিছু হয়েছে । তিতলি বলে।

কিছু না। বলতে বলতে পাশ ফিরে শোয় অভিরূপ। অবাক হয়ে জেগে থাকে তিতলি। কেন চলে গেল চামেলীদি ? কেন কাঁদল ? অভি অভি। অভি আবার ঘুমিয়ে

পড়েছে। বিরামহীন স্তব্ধতা ছেয়ে ফেলেছে সমস্ত চরাচর। তিতলি ডাকে, ঘুমিয়ে পড়লে তুমি অভি, আমার যে ঘুম আসে না গো, কেমন যেন লাগছে গো !

১৫

পরদিন দুপুরে তিতলি যখন ঘুমিয়ে, তখন ঝিলমিলের দেওয়ালের কাছে ভাসতে ভাসতে এল ধিতাং, এই শোন।

কী শুনব, এখন তিতলি ঘুমায় পাড়া জুড়ায়।

মার মন খারাপ আজ। ধিতাং বলে।

কেন রে কেন ?

ধিতাং বলে, তা জানি না।

আমরা যদি গান শুনাই? ঝিলমিল বলে।

না হবে না।

কেন হবে না? ঝিলমিল জিজ্ঞেস করে।

তুই একটা বুদ্ধু, এখন কি আমাদের গান আমরা ছাড়া আর কেউ শুনতে পায়?

ঝিলমিল বলে, না পায়।

কে শোনে, আমি তো জানি কেউ শোনে না।

কেন তিতলির পুতুলগুলো।

ধিতাং বলে, পুতুল কি মানুষ?

আমি জানি না, তুই ঘুমো, না হলে তোর দাপানিতে মা তিতলির ঘুম ভেঙে যাবে, মা বুঝবে মার ব্যাপার।

তখন ধিতাং বলে, আজ নিশ্চয় বাবা বলবে।

কী বলবে?

চামেলী কেন চলে। গেল হঠাৎ।

ইস, কী যে বলিস তুই, মাথা মুন্ড কিছু নাই, এই আয় গান করি।

তুই কর গান, আমি শুনি।

না, দুজনে করি।

ধিতাং বলে,পরে হবে গান, এই শোন, আজ তিতলি কথাটা জানবে।

কী জানবে?

ধিতাং বলে, তার আমি জানি কী, তা জানে ঐ অভি।

অভি কী জানে?

নাইয়র বলা চামেলী কেন না বলে চলে গেল কান্না মুছে ?

ঝিলমিল বলে, গেল তো গেল আমাদের কী?

ধিতাং বলে, চামেলী নাইয়র না শুনিয়ে চলে গেল কেন?
ইচ্ছে হল চলে গেল, তুই জানলি কী করে?
ধিতাং বলে, অভি আর তিতলি কথা বলছিল।
ঝিলমিল মাথা দোলায়, উঁহু, ওরা কথা বললে আমি ঘুমিয়ে পড়ি।
অভির কথা শুনলিনে, একটু জেগে থাকলিনে।
ঝিলমিল বলে, অভি তিতলি—বাবা আর মা, মা বাবাদের কথা শুনতে নেই।
কে বলল শুনতে নেই?
মালোবুড়ো।
মালোবুড়ো বললে হবে , আমাদের সব জানতে হবে।
মোটেই না, মায়ের পেটে থেকে কোনো কথা শুনতে নেই। ঝিলমিল বলে।
কেন শুনলে কী হয়?
ঝিলমিল বলে, অভিমন্যু হয়, তুই কেন শুনিস সব কথা?
আমি যে নাইওর শুনেছি, কী হল, এই শোন আজ রাত্তিরে বাবার কাছে মা শুনবেই কথা, না শুনলে ঘুম হবে না তিতলির, আমি তুই জাগব।
না না মোটেই না, মালোবুড়ো বলেছিল না শুনতে, শুনব না, শুনব না।
শুনলে কী হয় ?
আমাদের দোষ হয়।
দোষ হলে গো কী হয়?
জানি না রে জানি না, মালোবুড়োর কথা শুনতে হয়। ঝিলমিল বলে।
দুজনে এমনি কথা বলে যায়। কথা বলে ঘুমিয়ে পড়ে জেগে ওঠে, আবার ঘুমোয়। তিতলির বাজানো রবিশঙ্করের সেতার শোনে। শোনে আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছড়ার গান। হাট্টিমা টিম টিম টিম, তারা মাঠে পাড়ে ডিম তাদের খাড়া দুটো সিং.........., তিতলি তাদের শোনায় যেন। তারা শুনতে শুনতে দোল খায়। এই ভাবে রাত আসে। রাতে আবার ধিতাং বলে, এই জাগবি তো ?
কেন, জাগব যখন সবাই ঘুমোবে, তিতলি অভি ঘুমোলে জাগব।
না, তিতলি কী শোনে, শুনবি না?
শুনতে নেই দেখতে নেই।
ধিতাং চুপ করে গেল। তারপর রাত হল। তিতলি এবার ঘুমোবে। অভি এবার ঘুমোবে। ধিতাং বার বার ডেকেছে ঝিলমিলকে, এই ঘুমুলি।
ঝিলমিল জেগে কিন্তু সাড়া দেয় না। সে শুনবে না শুনবে না। শুনলে কী হয়, না অভিমন্যু হয়। অভিমন্যু কী ? ঝিলমিল জানে না, তবু মালোবুড়ো যখন বারণ করেছে সে শুনবে না। শুনতে নেই। জেগে থাকলেও দুকানে আঙুল দিয়ে থাকবে সে। ধিতাং ধিতাং

শুনিস না। ধিতাং সাড়া দেয় না। ঝিলমিল শুনবে না শুনবে না, কিন্তু ধিতাং তো শুনবে। সে নিজে শুনবে না করেও শুনে ফেলে। তার কৌতুহল বড় বেশি। রাত বাড়ে। সব নিঝুম হয়। তখন তিতলি ডাকে, এই শুনছ?

কী ? অভির গলা ঘুম জড়ানো।

চামেলীদি কী বলছিল তোমাকে ?

ওই বাংলাদেশ, ওই দেশে রাজাকারদের ফাঁসির দাবীতে আন্দোলন চলছে, তাই। অভি দ্রুত কথাটা বলে। তার ভাল লাগছে না তিতলির এই কৌতুহল।

তিতলি অবাক, তাতে চামেলীদির কী?

বাহ, ওই জন্যে তো ঠাকুরজামাই এপারে চলে এল প্রাণ ভয়ে।

চামেলীদি কানছিল কেন?

অভি চুপ করে থাকে একটু সময়, তারপর বলে, বাংলাদেশে পাকিস্তান ফিরিয়ে আনবে বলে রাজাকাররা ইসলামবিরোধী তকমা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রাম পুড়িয়ে দিচ্ছে,ি রেললাইন উড়িয়ে দিচ্ছে, শহীদ মিনার ভেঙে দেবে বলছে।

সরকার কী করছে?

সরকারও ভয় পেয়ে গেছে, সরকারকেও তারা ইসলাম বিরোধী বলছে।

তারপর ?

অভি বলল, তারপর কিছু না।

চামেলীদি কেন চলে গেল নাইয়র না শুনিয়ে, আমি কি কোনো অন্যায় করেছি? তিতলি বিড়বিড় করে বলল, এটার জন্য চলে তো যায় নি, কেন গেল?

আমি কী করে জানব?

আমি কি কোনো অন্যায় করলাম? তিতলি আবার বলে।

না তিতলি তুমি কেন অন্যায় করবে?

তাহলে চলে গেল কেন? তিতলি বির্মষ গলায় বলল।

ও কিছু না, এমনি, মন খারাপ তো, তাই। অভি বলল।

কেন মন খারাপ হলো হঠাৎ ?

কত কারণে হতে পারে। অভির সংক্ষিপ্ত জবাব।

তুমি জান না কেন কানছিল?

অভি চুপ করে থাকে। অভি কি জানে না? খুব জানে। অভি জানে। সব বলে গেল তো চামেলী। কথা একটাই, কিন্তু তা অনেক বড় যেন। সীমাহীন। সমুদ্রে ওঠা জল প্লাবনের মতো। সুনামী। ভয়ানক তুফান।

এমনিতে চামেলী কথা বলতে বলতে দিশাহারা হয়ে যায়। হয় তো ইতিহাস বলতে শুরু করবে। মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করবে। চামেলীরা মানে তার বাবা আর কাকাদের নিয়ে

ঠাকুরদা ঠাকুমা মুক্তিযুদ্ধের সময় এপারে এসেছিল। পিসির পরিবার আসেই নি। ঠাকুমা আর ঠাকুরদাকে নিয়ে তার বাবা কাকারা আন্দামানে আসে। তারা মালোপাড়ার কেউ না, কিন্তু পিসির বিয়ে হয়েছিল মালো ঘরে। পিসিদেরই উপাস্য ওই জোড়া ঠাকুর। পিসেরা যমজ। তাঁর বাবাও ছিল যমজ। তারা ছিল মুক্তিযোদ্ধা। তারপর আরো আছে। বলবে কি অভি তিতলিকে? না তিতলির সব জানা দরকার নেই। কিন্তু তিতলি জিজ্ঞেস করছে, আমাদের বাড়ি এসে কাঁদল কেন চামেলীদি? বলেছিল যে, নাইয়র শুনিয়ে যাবে।

ইস, ওই সব কেউ বিশ্বাস করে? অভি বলল, ওর মাথায় সব আজগুবি ধারণা, তোমার ওই চামেলীদি দুশো বছর আগের মানুষ।

আমি কি বিশ্বাস করি, করি না, কিন্তু গল্পটা কত সুন্দর।

কী গল্প বলেছিল তোমাকে?

তিতলি বলে, মালোবুড়ো শুক্লপক্ষের প্রতিপদে, সেই সরু সুতোর মতো একফালি চাঁদ দেখা যায় যেদিন আকাশে, ঈদের চাঁদ ওঠে যেমন, তেমনি চাঁদের রাতে গাঙের ধারে এসে নৌকোয় তুলে দেয় যমজদুটিকে, তারা নৌকোর দুই মুখে বসে বৈঠা মারে, মায়ের খোঁজ পাবে সেই পূর্ণিমার দিনে, তারা সেই এক পক্ষ ধরে চন্দ্রকলা দেখবে, সমুদ্রে বা নদীতে নাও ভাসিয়ে যাবে।

গল্প , এই সব গল্পের কোনো মানে আছে? অভি বলে।

চামেলীদি বলে, গল্প না, সত্যি। সত্যি।

সত্যি। সেই যে দিক নাই কুল নাই সেই গাঙের। রূপসা থেকে সেই গাঙে পড়ল নাও। কে জানে কীভাবে পড়ল এক গাঙ থেকে আর এক গাঙে। পদ্মা মেঘনা যমুনা, তিতাস, গঙ্গা, গোদাবরী, রেবা, কাবেরী, শিপ্রা, গম্ভীরা, গন্ধবতী, সরস্বতী, বিদ্যাধরী, ইছামতী, যে নদী বেঁচে আছে যে নদী হারিয়ে গেছে, সব পার হয়ে যেতে লাগল মন পবনের নাও। পড়ল সাগরে। ওপেন সি। দূর বহুদূরে দেখা যায় বুঝি ছায়া ছায়া বিন্দু। কছুয়া দ্বীপ। নাকি দ্বীপ নয়, চর পড়েছে পদ্মা, মেঘনায়। কোথাও কূল নাই। প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চর্তুথী.........চাঁদ একটু একটু করে বড় হচ্ছে। তারা যাত্রা করেছিল আবছা আলোয়, ঘন অন্ধকারে। এখন সমুদ্র আলো হয়ে উঠছে দিন দিন। ঢেউয়ে চাঁদ দোল খাচ্ছে। আকাশের তারারা তাদের দিক চেনায়। দক্ষিণ পুবে নাও বাইয়া যায় তারা। মালোবুড়ো যেমন বলে দিয়েছিল তেমন যায় ধ্রুবতারাকে পিছনে ফেলে। তারা যাচ্ছে মাতৃ গর্ভের দিকে। এই সমুদ্র গিয়ে মিশবে সেই সমুদ্রে। মাতৃজলে। মালোবুড়ো বলেই দিয়েছিল, সমুদ্রে সমুদ্র মেশে। তার ভিতরে আছে জননীসমুদ্র। সেই তোমাদের আশ্রয় দেবে। তারা সেই জননীর জন্য বড় গাঙ পাড়ি দেয়। চাঁদ আরো বড় হয়। তার অন্ধকার অংশটি আলো অধিকার করতে থাকে। তারপর দিক দেখা গেল অস্পষ্ট। তারা টের পায় চর্তুদশীর চাঁদ পূর্ণিমার গায়ে গা রেখেছে। মস্ত চাঁদ ভেসে উঠল তাদের সমুখ সমুদ্র থেকে। তারা এক

সমুদ্র থেকে আর এক সমুদ্রে প্রবেশ করছিল। আর প্রবেশের পর ঘুম এল। সুখ এল। এই সমুদ্র যেন তাদের কোল দিয়েছিল। একপক্ষের ক্লান্তি হরণ করল সমুদ্র জননী।

হুম। চুপ করে থাকে অভি। চামেলী বিশ্বাস সেই আন্দামানের দ্বীপে জোড়া ঠাকুরের পুজো করেও যমজ পায় নি। কিন্তু তিতলির যমজের সংবাদে বড় খুশি। বলেছে, সাবধানে রাখো বউকে অভিবাবু, আমারে তোমার দিদি মনে করো।

তারপর কী বলল, কাঁদল কেন? তিতলি আবার জিজ্ঞেস করে।

তিতলি ভুলছে না। অভি যত এড়িয়ে যেতে চায়, তিতলি তত জানতে চায়, কথাটাকে আঁকড়ে ধরে। অভি বলল, শোনো তিতলি, ওদেশে খুব গোলমাল তো, চলে এল পিসতুতো দিদির ছোটননদ আর ঠাকুরজামাই, সেই জন্য মন খারাপ।

না, ওই জন্য না, অন্য কিছু হয়েছে।

কিছু হয় নি।

ইস, আমরা সারাদিন গল্প করতাম, রাতেও রেখে দিতাম, খুব খারাপ লাগছে, কিছু একটা হয়েছে, তুমি জান না?

না, তা কেন? ঢোক গিলল অভিরূপ, না না না কিছু হয় নি।

তিতলি বলল, তুমি চেপে যাচ্ছ।

অভিরূপ চুপ করে থাকে। তিতলি ঠিক আন্দাজ করেছে। চামেলী শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে আরো কথা বলে গেছে। বাংলাদেশে এখন রাজাকার, মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে তরুণ প্রজন্ম পথে নেমেছে। এ যেন আর এক মুক্তিযুদ্ধ। এর ফলে সাম্প্রদায়িক শক্তি গ্রামে-গঞ্জে সংখ্যালঘুর গ্রাম ধ্বংস করছে। আবার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের যারা তাদের মারছে ইসলাম বিরোধী বলে। তাতে মুসলমানরাও মরছে। গৃহযুদ্ধ লেগে গেছে দেশটায়। তবে এক পক্ষই অস্ত্র হাতে নেমেছে। অন্য পক্ষ নিরস্ত্র। মালোপাড়ায় আক্রমণ হয়েছে।

তিতলি বলে, কিন্তু চলে গেল কেন, মালো পাড়ায় কী হয়েছে ?

হ্যাঁ, চলে গেল কেন সে? ধিতাং বিড়বিড় করে, মালো পাড়ায় কী হয়েছে, কাঁদল কেন সে? এই ঝিলমিল, শুনছিস ?

জবাব পায় না ধিতাং। সে ঘুমিয়ে আছে। সে মালোবুড়োর কথা মনে রেখেছে। মা বাবার কথা শুনতে নেই। মা-বাবার ঘনিষ্টতা দেখতে নেই। দেখলে মঙ্গল হয় না। মঙ্গল কী? মঙ্গল কী তা জানে না ধিতাং। সে সাড়া না পেয়ে বোঝে ঝিলমিল ঘুমিয়ে আছে অন্ধকারে মাতৃজলে। মাতৃসমুদ্রে। লবন জলে। সে একা একা কান পাতে। তিতলির কথা শোনে অভির কথা শোনে। অভি বলতে চায় না, তিতলি শুনতে চায়। তখন অভি বলে, কিছু না তিতলি, মালোপাড়া পুড়িয়ে দিয়েছে রাজাকার আর পাকিস্তানপন্থী দল, ছাই করে দিয়েছে সব ঘর, মালোপাড়ার সবচেয়ে বুড়ো ছিল একজন। একশোর উপর বয়স। সেও মুক্তিযোদ্ধা

ছিল, সে ছিল মালোবুড়ো, তার ঘরে শেকল তুলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, বুড়ো জ্যান্ত পুড়ে মরেছে, সঙ্গে একটা শিশু, ননদিনীর মেয়ে, চারবছর বয়স, বুড়ো তাকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়েছিল।

কী বলছ? তিতলি কেঁপে উঠে জিজ্ঞেস করে।

না শুনলেই ভাল হত তিতলি, খারাপ খবর, খুব খারাপ খবর।

মালোবুড়ো?

হ্যাঁ, জীয়ন্ত পুড়িয়ে মেরেছে আগুনে, ভয়ানক মরণ, তার সঙ্গে চার বছরের শিশুকে

! ও মা গো? তিতলি কেঁদে ওঠে।

থাক তিতলি, শুনছ তিতলি, মন খারাপ করো না, অনেক বয়স হয়েছিল বুড়োর, বলত রাজাকারের ফাঁসি না দেখে মরবে না। ফাঁসির র্অডার হয়েছে শুধু। রেডিওতে শুনেছিল সে। শুনতে শুনতে বলেছিল, ফাঁসি না হলেও পারত, কিন্তু শাস্তি পাক, শাস্তি পাক, জয় বাংলা।

মালোবুড়ো ! অগ্নিদাহন। মৃত্যু। মালোবুড়ো মরেছে। শুনতে শুনতে ধিতাং অন্ধকার মাতৃজলে একা একা ভেসে কুঁকড়ে যায়। এ কোন কথা? হায় হায় হায়, এই কথার মানে কী? তারা তো দুটি কথাই জানে, জন্ম আর মৃত্যু। মালোবুড়ো সেই গহীন রাতে তাদের নাও ভাসিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, এক পক্ষ এক শুক্ল পক্ষ ভেসে গিয়ে মায়ের খোঁজ পাবি, আবার কোনো এক সময় অনেক চাঁদ অনেক সূয, অনেক র্বষা অনেক শীত-গ্রীষ্ম পার করে আর এক প্রতিপদে রওনা হয়ে এক কৃষ্ণ পক্ষ ধরে ভেসে অমাবস্যার রাতে মালোবুড়োর কাছে ফিরে আসবি, সেও যেন আর এক মাতৃর্গভেই ফেরা। তার নাম মরণ। হায় গো, মালোবুড়োকে আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে রাজাকারের দল। গুঁড়িয়ে দিয়েছে জোড়াঠাকুরের থান। মরেছে মালোবুড়ো। সঙ্গে একটা শিশু। মরণ কী? মরণ অন্ধকার। মরণ যেন মরুভূমি। এক ফোটাও জল নেই মরণে। এমন মাতৃজল নেই সেখানে। মায়ের কোল নেই। গান নেই। সুর নেই। নিজের কথা নিজেই শুনতে শুনতে ধিতাং ছোট হয়ে যেতে থাকে। কুঁকড়ে এইটুকু। আতঙ্কে নীল। সে ডাক দেয়, কোথায় মোর ঝিলমিল,

কালা বৈঠা বেয়ে যাও কোন সওদাগর
গাঙের উপারে তুমি কইয়ো খবর।

কী খবর? আমার ভয় করে যে খুব। দম বন্ধ হয়ে আসে গো। ভাই আমি না ভইন আমি তা জানি নে, আমি ধিতাং সে ঝিলমিল। সওদাগর খবর দিয়ো। কোথায় সওদাগর ? অন্ধকারে গাঙের নোনা পানি শুকিয়ে যায় গো। জল কমে যায়। জল শুকোলে আমি কোন গাঙে ভাসাব আমার নাও ? ও ঝিলমিল ঝিলমিল। ও আমার সোনা ভইন না সোনা ভাই, আমি তোর সোনা ভাই না সোনা ভইন, কিছুই জানিনে আমি। ঝিলমিলরে মালোবুড়ো

মরণে গেছে। আমিও কি সেই পথে যাচ্ছি গো ? অতিঘোর অন্ধকার সব। সব আলো মুছে নিবিড় অন্ধকার। মা গো মা। মা শুনছো। কাঁদছ মা অন্ধকারে। আমি কেন তোমাদের কথা শুনতে গেলাম ? মা বাবার কথা শুনতে নেই, শুনলে অভিমন্যু হয়। কে অভিমন্যু, ও মা মা ? মালোবুড়ো বলেছিল তা। আমায় বাঁচিয়ে রাখো মা। কেন মরণের কথা শোনালে মাগো।

মাতৃগর্ভের আলো ধীরে ধীরে কমে আসে। আঁধার অনন্ত হয়ে যেতে থাকে। সব মায়া ফুরিয়ে যায়। কিছুই আর রহিল না। সে ছটফট করে বাতাসের জন্য। জলের জন্য। তার সোনার নাও বসে গেছে জলশূন্য গাঙের মাটিতে। ক্রমশ সে তার কণ্ঠ হারায়। নিশ্চল হয়ে যেতে থাকে নাও-এর মতো। তখন সেই জলহীন গাঙের আকাশে একটিও নক্ষত্র নেই। চাঁদ নেই। সূয নেই। কালঘুমে যেন ডুবেছে তার দিক-দিগন্ত। আকাশ মাটি সমুদ্র অরণ্য সমুদ্র। তার চোখ বুঁজে আসে। দম আটকে আসে। কৃষ্ণপক্ষের নাও কৃষ্ণপক্ষে যায়।

তারপর একসময়, সে দিন না রাত্রি, কিছুই জানে না ঝিলমিল, জেগে উঠে চাপা গলায় ডাক দিল, এই এই, এই নাইয়া, নাইয়ারে।

নাইয়া শব্দটি যে কোথা থেকে জানল সে, কী করে তার মুখে এল, তা জানে না, শুধু ডাকল। সাড়া পেল না। সমস্তদিন সমস্তরাত ধরে ডেকে গেল, কালা বৈঠার নাইয়া রে……, সাড়া পেল না। তার সমুদ্র দুলছে, ঢেউ দিচ্ছে, কিন্তু নিস্তব্ধ। কোথাও কোনো স্পন্দন নেই। সে কেঁদে উঠল, কান্না কি জানত না, কিন্তু হয়ে গেল। ও ধিতাং ধিতাং, ওরে নাইয়া নাইয়ারে, কোন গাঙেতে হারাইলি তুই কালা বৈঠা নিয়ারে।

১৬

ঠিক দুদিন বাদে সকালবেলায় তিতলি ডাকল অভিকে, শুনছো।

কী হল ?

আমি বলি নি, এখন মনে হচ্ছে বলতে হবে, আমার কেমন যেন লাগছে। গলার স্বর কেঁপে গেল তিতলির।

কেন কী হল ?

নিচেরজন দুদিন ধরে ঘুমিয়ে আছে, জাগছে না কেন? তিতলি বলল।

এমন সুখের ঘুম কি আর আছে ! অভি হাসল। তারা চায়ের টেবিলে বসেছে। বাইরে উজ্জ্বল হেমন্তের সোনালি রোদ। বাতাসে এখনই হিম হিম ভাব এসেছে। তিতলি জানে এখন এই শহর ছাড়ালেই ফসলের পৃথিবী পূর্ণতার ভারে নুয়ে আছে। পূর্ণিমার চাঁদের মতো সেই পূর্ণতা। পূর্ণ জোয়ারের মতো সেই পূর্ণতা। কলকাতা শহর সেই পূর্ণতার থেকে অনেকটা দূরে, বরং শহর এখন রিক্ত। উৎসবের বিপুল এক উল্লাসের পর

এখন শ্রান্ত। সব ফুরিয়ে যেন ঝিমোচ্ছে। তিতলি বলল, আমার কেমন যেন লাগছে, ভেবেছিলাম সত্যি ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে একদম নড়াচড়া করছে না।

ঘুমোচ্ছে বললে তো। অভিরূপ বলে।

কী জানি। বিড়বিড় করে তিতলি, ওইজন তো দাপায় খুব, কী হল, দুদিন তো একনাগাড়ে কখনো হয় নি!

উঠবে ঘুম থেকে। বলল অভিরূপ।

তিতলি বলল, যেটা ঘুমোয় সেইটা তো জেগে আছে, ঘুমোচ্ছে, ঘুমিয়েও নড়ছে, যেন পাশ ফিরছে, কিন্তু অন্যটা কিছুই করছে না।

বেশি ঘুমোচ্ছে। অভি বলল।

তিতলি উঠে ফ্ল্যাটের পায়চারি করতে লাগল। তার মনে অদ্ভূত এক সন্দেহ জেগে উঠছে আজ ভোর থেকে। কেমন যেন মনে হচ্ছে। গা যেন আজ সকাল থেকে ভার হয়ে আছে। ও অভি, অভি?

অভি বলল, এমন করছ কেন?

তিতলি ডাকে শাশুড়িকে, ওমা , মা।

শাশুড়ি মাধবী জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে তিতলি?

অভি বলল, কিছু হয় নি, রাতে হয়ত ঘুমোয় নি ভাল করে।

না না মা, মা আমার ভয় করছে, একজন সাড়া দিচ্ছে না দুদিন ধরে।

মাধবী চুপ করে শুনলেন, তিতলির দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন, অমন হয় তিতলি, অমন মনে হয়, সবদিন কি দাপাবে, হয় রে, এমন হয় যে তিন-চারদিন ঘুমিয়েই থাকে, অভি যখন পেটে, এমন হতরে।

সত্যি বলছ মা ?

মিথ্যে বলব কেন, সে ঘুমোচ্ছে নিজের মনে।

তিতলি বলে, কিন্তু মা আমার কেমন মনে হচ্ছে যে, ঘুমিয়ে তো একবার নড়বে।

অভি বলল, কিছু হয় নি, তুমি রেস্ট নাও, ও নিজে নিজে জেগে যাবে।

তিনজনের এই কথোপকথন শুনছিলেন অভির বাবা সুজন চন্দ। তিনি কী যেন ভাবছিলেন। তিতলির মুখ দেখে তাঁর কেমন যেন মনে হল। মনে হল তিতলির কথার ভিতরে ভয় জড়িয়ে আছে। তিতলির কথার ভিতর থেকে উদ্বেগ ফুটে বেরোচ্ছে। তিনি নিজে উদ্বিগ্ন হলেন। বললেন, আর একটু দ্যাখো বউমা, আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছি।

তিতলি ঘরে এসে বসল। তার মনে পড়ে গেল সেই পোর্ট ব্লেয়ারের কথা। সেই ঘরের জানালা দিয়ে সমুদ্র। সমুদ্রে চাঁদের সাম্পান। সাম্পানের দুই প্রান্তে দুইজন। তিতলি দেখল রোদ এই সকালেই মরা মরা। তেজ নেই। আকাশ ঘোলাটে। অথচ হেমন্ত পড়ে গেছে দিক-দিগন্তে। তিতলির মনে হল, দূর সেই ভৈরব কিংবা কপোতাক্ষ তীরে মালো

পাড়ায় হেমন্তের সকাল। পরিপূর্ণ পৃথিবী। সে পেটে হাত রাখে। উপরেরজনের দপদপ টের পাচ্ছে সে, কিন্তু নিচেরজন যে একেবারে নিস্তব্ধ। একটুও স্পন্দন নেই যেন। উফ, নিচেরটা যে বেশি দাপায়। গান শোনালে বাজনা শোনালে যেন নাচতে শুরু করে। সে সিডি প্লেয়ারে শচীনদেব বর্মণ চালায়। বাজে তাকডুম তাকডুম বাজে বাংলাদেশের ঢোল......। গান যদি ঘুম ভাঙায়। এখনই বুঝি সে ঘুম ভেঙে উঠবে। নরম পায়ে মায়ের পেটে ধাক্কা মারবে। এই যে উপরেরজন নড়ছে। কিন্তু নিচেরজন কই ? অপেক্ষা করতে থাকে তিতলি। তার দম যেন বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। ওরে তুই জাগ। জেগে উঠে গান শোন। এই যে সেই গান, ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলের জলে ঢেউ খেলিয়া যায়......, কে যায় রে ভাটি গাঙ বাইয়া, আমার ভাইধনরে......। প্লেয়ার বন্ধ করে দেয় তিতলি। উফ, সে কেন সাড়া দিচ্ছে না? সে সলিল চৌধুরী সং'স সিডি বসিয়ে দেয়। ধিতাং ধিতাং বোলে......নাচ নাচ নাচ। আয়রে আয় লগন বয়ে যায়, মেঘ গুড়গুড় করে চাঁদের সীমানায়.........। আয়রে আয়, আয় সোনারা আয়। ওই গানের সঙ্গে দুলত যেন দুইজন তালে তালে। এখন একজন নড়ছে, কিন্তু আগের মতো নয়। তিতলি দরজা বন্ধ করে গানের ভলিউম বাড়িয়ে দেয়। ওরে শুনছিস তোরা। কইরে কই, কই কই? আমার সোনার চাঁদেরা কই? তিতলি নুয়ে পড়ে। সে টের পায় তার গর্ভের অন্তঃস্থলে কোথাও নেমেছে বুঝি অনন্ত রাত্রি, অনন্ত নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারছে না পারছে না পারছে না নিচেরজন যার নাম দিয়েছে সে ধিতাং। তিতলি সিডি প্লেয়ার আবার বন্ধ করে। এবার রবিশঙ্কর আসেন সেতারে রাগ ভৈরবী নিয়ে। আয় আয় আয়, ভৈরবীর সঙ্গে জেগে ওঠ।অনন্ত রাত্রির অবসান হোক। আলো আসুক সোনা আলো আসুক। তিতলি মাথা নুয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছে। তার চোখে এখন সমুদ্রের জল। আলো আসিতেছে, কিন্তু সেই আলোর ভিতরে মায়া নাই, সে নাই। মাধবী ভিতরে এলেন দরজা ঠেলে, তিতলির পিঠে হাত রাখলেন, কী হয়েছে রে, এমন হয়, সাতদিন ধরেও ঘুমোয়, তুই ভয় পাচ্ছিস কেন?

তিতলির যে মনে কু ডাক উঠেছে। সে মাথা নামিয়েই থাকল। ভৈরবীর সুর এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল। রবিশঙ্কর রাগ-রাগিনী ভুলে গেছেন যেন। এলোমেলো আঙুল বসতে লাগল সেতারের তারে। দানবে দাপাদাপি করছে যেন সেতারে। মালোপাড়ায় আগুন। দাউ দাউ আগুন। আগুনে সমস্ত সুর ছাই হয়ে বাতাসে ঝরে পড়ছে। বাতাস তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোথায় না কোথায়। ভৈরবীর ভিতরে হিংস্র গর্জন মিশিয়ে দিচ্ছে কে যেন। ক্রন্দন, আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছে তিতলি। ঠিক তখন অভির পাশে বসে তার বাবা সুজন চন্দ ডাক্তার বসুকে ধরলেন, কী হতে পারে বলুন তো ডাঃ বোস, বউমা বলছে এই কথা।

ডাক্তার বললেন, সন্ধেয় চেকাপ করব, উদ্বিগ্ন হবেন না, না দেখে কিছু বলা যাবে না।

কী হতে পারে ডাঃ বোস ?

সাইলেন্টলি ঘুমোয়, আমি তো সাতদিন আগে দেখলাম না, সব ঠিক ছিল মনে হয়।

হ্যাঁ, ন'য়ে গিয়েছিল চেকাপে, আজ সতের।

আসুন সন্ধেয়। বলে ডাঃ ফোন রাখলেন। সুজন তাঁর ছেলেকে বললেন, এমন হয় বললেন ডাঃ বোস, টেনশন করতে বারণ কর।

অভি বলল, এতদিন তো হয় নি এমন।

হয় নি বলে হবে না, তা তো নয়। বলতে বলতে সুজন আবার মোবাইল ডায়াল করলেন, হ্যালো মিঃ চৌধুরী, গুড মর্নিং।

অনিমেষ সাড়া দিল, সুপ্রভাত।

সন্ধেয় ফ্রি আছেন আপনি কিংবা মিসেস, বা দুজনেই ?

কেন ?

তিতলিকে চেকাপে নিয়ে যাব, যদি থাকেন।

অনিমেষ বলল, ন'তারিখে হলো না ?

আজ আবার একবার। সুজনের গলা আচমকা কেঁপে গেল।

আজ কেন, একমাস অন্তর হয় যে ?

না কিছুই না, জাস্ট দেখবেন ডাক্তার একবার।

আচ্ছা , তিতলি ভাল আছে তো?

সুজন বললেন, ভালো আছে ভালো আছে, আসুন সন্ধেয়, কথা হবে।

দুজনকেই যেতে হবে?

আপনি ব্যস্ত?

অনিমেষ বলে, একটু।

তাহলে তিতলির মাকে আমরা তুলে নেব।

ঠিক আছে। অনিমেষ জিজ্ঞেস করল, এত তাড়াতাড়ি কেন আবার ?

কিছু না, ডাক্তার বললেন। আবার গলা কেঁপে গেল সুজন চন্দের।

ফোন বন্ধ হয়ে গেলে থম মেরে বসে থাকল অনিমেষ। আজ এক তরুণ কবির কবিতার বই বেরোবে। তাকে থাকতে হবে। সেই যে অভিষেক আর অমল গিয়েছিল তার সঙ্গে আলিপুরদুয়ার, জয়ন্তী নদীতে, অমলের বই বেরোবে আজ। অনিমেষ সেই বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করবে। তাকে যেতেই হবে। সুদীপ্তা যাক। সে এর কী বোঝে? সুদীপ্তাকে বলল অনিমেষ বিকেলে চেকাপে যাবে তিতলি আবার যেতে হবে। হঠাৎ কেন? অনিমেষ যা শুনেছে তাই বলল। সুদীপ্তা চুপ করে গেল। ফোন করবে করবে ভেবেও চুপ করে থাকে। সাত-আট দিনের ভিতরে আবার চেকাপ কেন ? বিকেলেই জানবে? তিতলি তো ফোন করে, আজ এখনো করে নি। ঘন্টা দুই বাদে ল্যান্ড লাইনে ফোন এল। অনিমেষ দেখল কারো সঙ্গে কথা বলছে সুদীপ্তা। তিতলি নয়। ফোন শেষ করে সুদীপ্তা এ ঘরে এল, বলল, তিতলির শাশুড়ী করেছিলেন ফোন।

হ্যাঁ, আজ আবার চেকাপে নিয়ে যাবে।

সুদীপ্তা বলল, তুমি কি জানো কেন ?

না, কেন ?

সুদীপ্তা বলল, বুঝতে পারলাম না, দুদিন ধরে দুজনেরর একজন রেসপন্স করছে না মনে হচ্ছে তিতলির, আবার একটু আগে বোধ হয় সাড়া দিয়েছে তাও বলছে, ওঁরা ডাক্তার দেখাবেন আজ আবার।

সাড়া দিয়েছে তো ? অনিমেষ বলল।

সুদীপ্তা বলল, এমন হয়, কিন্তু তিতলি খুব ভয় পেয়ে গেছে।

তার মানে, রেস্পন্ড করছে তো দুজনেই ?

তখন সুদীপ্তার ফোন আবার বেজে উঠল। এবার তিতলি। হ্যালো মাম, মাম, শুনেছ তো, কিন্তু না, আধ ঘন্টা আগে আমার একবার যেন মনে হল তা নয়, বেবি ইজ রেস্পন্ডিং।

কী মনে হল? সুদীপ্তা জিজ্ঞেস করে, নড়ছে ?

হ্যাঁ, মা, নড়েই আবার ঘুমিয়ে যায় কি ? তিতলি আকুল স্বরে জিজ্ঞেস করে।

যায় তো, তুই এমন করছিস কেন?

তিতলি বলে, কী একটা খারাপ খবর বলে গেছে চামেলীদি।

কে চামেলী ?

দিগলিপুরের চামেলী মল্লিক, আন্দামানের।

সেই জোড়া ঠাকুর?

হ্যাঁ মা।

সে এসেছিল কবে ?

গড়গড় করে কী যে বলতে লাগল তিতলি। কিছু বোঝা গেল কিছু গেল না, সুদীপ্তা শুনতে শুনতে বলল, তিতলি তুই এসব নিয়ে মাথা ঘামাস কেন, এখন শুধু ভাল কথা চিন্তা করতে হয়, তোর কোনো ভয় নেই মা, কিছুই হয় নি, এমন হয়, ওই তো নড়েছে বলছিস, কিছুই হয় নি তোর।

হ্যাঁ মা, তাই মনে হয়।

তাই, অযথা ভয় পাস কেন? সুদীপ্তা বলে, এমন হয়, ওরা এখন ঘুমোবে জাগবে, খেলবে, যেমন মনে হবে তেমন করবে ওরা।

জানি মা, একবার নড়ল এই একটু আগে, এখন আর নড়ছে না।

ঘুমোতে দে, যত ঘুমোবে তত ভাল থাকবে।

মা, ডাক্তার বলেছিলেন দিনে আঠেরবার নড়লে, স্বাভাবিক।

ওর কোনো ঠিক নেই তিতলি, ওভাবে বলা যায় না, তুই নিজেই তো শুধু ঘুমোতিস, কী শান্ত ছিলি।

ওকে মাম, বাবা আছে ? তিতলি কথাটা ঘুরিয়ে দিল। সে জানে মা তার ছোটবেলার কথা বলছে। সে পুতুল খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়ত নিজে নিজে। কোথায় মেয়ে কোথায় মেয়ে, ওই যে খাটের তলায় ঢোকা পুতুল আনতে গিয়ে নিজেই পুতুল নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তিতলি তো সেই কথা বলছে না। মা কি কথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে? মা টের পাচ্ছে কিছু। মায়ের মেয়ে মা হতে যাচ্ছে, মা তো টের পাবেই। মা মা, বাবা কই?

অনিমেষ নিল ফোনটি। ওপারে তিতলি। তিতলির ভিতরে দুইজন। অনিমেষ বলল, তুই হঠাৎ ঘাবড়ে গেলি কেন তিতলি মা।

জানি না বাবা, বাবা তোমাকে বিকেলে আসতে হবে না, আমি ভাল আছি, আর বিকেলে চেকাপে যাব, তারা ভালই আছে মনে হয়, আচ্ছা বাবা বাংলাদেশে খুব গোলমাল চলছে?

হ্যাঁ, নেট-এ তো সব খবর পাচ্ছি।

তোমার তো বাংলাদেশে অনেক বন্ধু।

হ্যাঁ, ফেসবুক তো বাংলাদেশের বন্ধুতে ভরা।

আমি আর ফেসবুকে বসি না বাবা, বাংলাদেশের বন্ধুদের জিজ্ঞেস করো না কী হচ্ছে, মালোপাড়ায় কী হয়েছে সত্যি সত্যি।

কেন রে, তুই কী জানতে চাস?

চামেলীদি যা বলে গেছে তা কি সত্যি?

কী বলে গেছে তোর চামেলীদি, তাতে তোর কী তিতলি।

তিতলি ফিসফিস করে কেঁদে উঠল, মালোবুড়ো যে ওদের পাঠিয়েছে বাবা, টুইন বেবি ওই ভাবে আসে, কিন্তু মালোবুড়ো কি সত্যি সত্যি......? তিতলি কথা শেষ করতে পারে না। অনিমেষ বলে, কী সব বলছিস তুই তিতলি মা, উফ, এসব কি সত্যি হয়, না হতে পারে কখনো?

ফোন কেটে যায়। তিতলি কেটে দিল না এমনিই কেটে গেল বোঝা গেল না। সুদীপ্তা বলল, কী সব ভেবে বসে আছে মেয়েটা, আচ্ছা বাংলাদেশে কী হল তাতে ওর কী, ও কি বাংলাদেশ দেশ দেখেছে কোনোদিন, ওর কি জন্মভূমি ওইটা?

অনিমেষ বলল, বাংলাদেশে খুব গোলমাল হচ্ছে।

তাতে তিতলির কী? সুদীপ্তা আচমকা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। কী সব কথা বলছে মেয়েটা ? কে এক বুড়ো মারা গেছে বাংলাদেশে, তাই ওর মন খারাপ, ভেঙে পড়েছে। ইসস! তাই কি কখনো হয়? কে চামেলী? আন্দামান থেকে মৃত্যু সংবাদ নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে এল? উফ, তুকতাক করে গেল নাকি? বলা যায় না তো। এসেছে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের একটি

দ্বীপ থেকে। সাগর দিয়ে ঘেরা। সেই সমুদ্র আর দ্বীপ, দ্বীপ আর অরণ্য তো এইসব নিয়ে এখনো বেঁচে আছে। কী যমজ ঠাকুরের গল্প শুনিয়েছে সে তিতলিকে। ঐ সব কি সত্যি হতে পারে? কেউ কোনদিন শুনেছে জোড়া ঠাকুরের কথা? সুদীপ্তার রাগ হলো অদেখা চামেলীর উপর। কেন এইসব শুনিয়ে মেয়েটাকে দুর্বল করে দিয়ে গেল সেই আন্দামানি বউটি। জারোয়াদের জাদু আর তুকতাক জানে নাকি ঐ চামেলী? ভয় করল সুদীপ্তার। বলা যায় না। কে কী লুকিয়ে রেখেছে মনে, তা বলবে কে? তার বাপের বাড়ির পাড়ায় এক প্রতিবেশি আছে। রতন হালদার। সব সময় লোকের ক্ষতি করতে চায়। হয়রানি করে মিথ্যে বলে। ওতেই তার আনন্দ। চামেলী আসলে কেমন, কী চায়? যত্তসব গালগপ্পো শুনিয়ে মেয়েটার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। সুদীপ্তা নিজের মনে বলতে থাকে। সুদীপ্তার তো ওই সব বিশ্বাস করার কথা নয়। সে তুকতাকে বিশ্বাস করে বলে জানে না অনিমেষ। তাহলে কি সুদীপ্তার ভেতরের খোঁজ রাখে না। সুদীপ্তা যা বলছে তা কি সত্য হতে পারে? চামেলী তো নাইওরের গান শুনায়। সুদীপ্তা বলল, বাংলাদেশের ওসব গোলমালের খবর শুনে ওর কী হবে?

অনিমেষ চুপ করে থাকে। শাহবাগ চত্বরে গড়ে ওঠা আন্দোলনে সেও তো নিজেকে মনে মনে জড়িয়েছে। ফেসবুকে লম্বা স্ট্যাটাস দিয়েছে। তার ফলে তার ইনবক্সে অনেক গালিগালি এসে পড়ছে। কাফের তোরে দেখে নেব। কী চাস তুই? ইন্ডিয়ার লোকের কী দরকার বাংলাদেশের ব্যাপারে মাথা গলানর? তারা শুধু বাংলদেশের মানুষ নয়। তারা এদেশেরও। বলছে শাহবাগ আন্দোলন হল কাফেরদের জমায়েত, ইসলামকে ধ্বংস করতে ওই সব দাবী তুলেছে ইসলাম বিরোধীরা।

একজন তার সাইটে এসে লিখে গেছে, কাদের মোল্লাকে আল্লাহ রক্ষা করবেন, তুই বলার কে ইন্দুরের বাচ্চা, সাবধান।

শুধু সে কেন, তিতিরও লিখেছে শাহবাগের পক্ষে। কেন লিখলি তিতির? তিতির বলেছে, তোমরা যখন বলতে আমার নাম তোমার নাম ভিয়েতনাম, তখন?

সত্যি তো, তখন কেন বলত? সেই অল্প বয়সে। বলত যদি এখনও বলতে হবে। দুনিয়ার কোথাও অন্যায় হলে বলতে হবে। ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসন নিয়ে যেমন বলতে হবে, বাংলাদেশের ছাত্র যুবর কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাতে হবে। আর এদেশে ধর্ষণ, হত্যা, মৃত্যু, আগ্রাসন নিয়ে বলতে হবে।

সুদীপ্তা আবার বলল, ফালতু কথায়, এলেবেলে কথায় মাথা ঘামাতে বারণ করে দিতে হবে।

অনিমেষ মনে মনে বলে, মাথা যদি থাকে, তাকে ঘামাতেই হবে। সুদীপ্তা নিজে কি কদিন আগেও শাহবাগ আন্দোলনের খুঁটিনাটি তাকে জিজ্ঞেস করে নি? ধর্ষণ খুন যা ঘটে চলে সমস্ত দেশে তা নিয়ে সুদীপ্তা কি নিজের উত্তেজনা প্রকাশ করে না ? পাকিস্তানের

সেই মেয়েটি মালালা, ছত্তিশগড়ের সোনি সোরির কথা নিয়ে উত্তেজিত হয় না? মালালা ইস্কুল যেতে চেয়েছিল। তাকে নিষেধ করেছিল সন্ত্রাসবাদীরা। সেই নিষেধ অমান্য করায় তাকে খুন করতে চেয়েছিল সন্ত্রাসবাদীরা। কী সাহস সেই বালিকার! দুনিয়াজুড়ে মেয়েরা নিজের অনেক কথা বলতে চাইছে। সোনি সোরি নামের মেয়েটি তো অবিরাম পুলিশি অত্যাচারেও আত্মসর্মপণ করে নি। তাকে মাওবাদি তকমা দিয়ে ছত্তিশগড়ের পুলিশ কী ভয়ানক অত্যাচার না করেছে। মেয়েটি শুধু নিজেদের অরণ্য, নিজেদের পাহাড় কর্পোরেটের হাতে বিলিয়ে দেওয়ার বিপক্ষে কথা কণ্ঠ তুলেছিল। অনিমেষ বলল, ওতে কিছু হয় না সুদীপ্তা, ও কি খবরের কাগজ পড়া ছেড়ে দেবে তাহলে, মানুষের জন্ম এক স্বাভাবিক ঘটনা, কোনো ভয় নেই।

আহা ভয়ের কথা বলছে কে? সুদীপ্তা স্বাভাবিক হয়ে উঠতে চাইছে। না হলে তার উপায় নেই। উদ্বেগ যাচ্ছে না।

ওকে বলো ম্যাক্সিম গোরকির মানুষের জন্ম গল্পটার কথা মনে করতে।

সুদীপ্তা বলল, বলব, বাংলাদেশে ঠিক কী হচ্ছে?

হেসে ফেলল অনিমেষ, বলল, জমায়েত হবে, মিছিল হবে বাংলাদেশের ছাত্রদের পক্ষে, তুমি যেও তিতিরের সঙ্গে।

১৭

কবিতার বই উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল। কয়েকজন কবিতা পাঠ করবে এখন। অনিমেষ নেমে এসেছিল মঞ্চ থেকে। জীবনানন্দ সভাঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে চায়ে চুমুক দিয়েছে, একজন তাকে একটি লিফলেট দিল, বাংলাদেশের রাজাকার বিরোধী আন্দোলনের সর্মথনে জমায়েত একাডেমি অফ ফাইন আর্টিস –এর সামনে। তখন তার ফোন বাজল, ফোনটা সুদীপ্তার, শুনছ, তুমি কোথায় ?

কী হল, ডাক্তার দেখান হল?

সুদীপ্তা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ওর একজন নেই গো, দুজনের একজন চলে গেছে, আমি এই ভয় পাচ্ছিলাম গো।

অনিমেষ এই প্রথম যেন নিজের বয়সকে অনুভব করল, ভয় পেল, কী বলছ তুমি ?

সুদীপ্তা কান্না সংবরণ করতে করতে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ গো, আমাদের মেয়েটার কী হবে, তুমি এখনই চলে এস রাজবল্লভ পাড়ায়, আমি ওদের বাড়িতে আছি।

থর থর করে কাঁপছিল অনিমেষ। এক লহমায় তার বয়স কত বেড়ে গেল যেন। চুল দাড়ি শাদা হয়ে সে যেন বুড়ো। শরীর মন অশক্ত। কমল ছিল পাশে, তাকে বলল, আমি চলে যাই কমল, এখনই যেতে হবে, তিতলির খুব বিপদ।

কী হয়েছে অনিমেষদা ?

আমি সবটা জানি না কমল, কাউকে বল একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে, আমাকে যেতে হবে। বলতে বলতে অনিমেষ এগোয়। কমল দেখল নুয়ে গেছে অনিমেষ চৌধুরী, অথচ এই মানুষটির তারুণ্যের কোনো সীমা নেই। ইনি অতি তরুণের বন্ধু। বয়স এঁকে ছুঁতে পারে নি। সে বলল, সৌরভ গাড়ি এনেছে, ওকে বলে দিচ্ছি, পৌঁছে দেবে, অনিমেষদা আমি যাব সঙ্গে ?

না, তোমরা অনুষ্ঠানটা শেষ করো, দরকার পড়লে বলব। কথাটা বলে অনিমেষ দাঁড়িয়ে থাকে। কমল যায় সৌরভের গাড়ি ঠিক করতে। আবার ফোন, তিতির, বাবা বাবা, কী হয়েছে জানো বাবা?

তুই কোথায়?

আমি বাসে, মা বলল দিদির বাড়ি যেতে, কেন বাবা, তুমি জান, মা'র গলাটা ভাল লাগল না।

আমি জানি না কিছু, আমি আসছি, আসছি। অনিমেষ ফোন কেটে দিল। অনিমেষ ফোন কাটার সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষের দাদা ফোন করলেন সল্টলেক থেকে, হ্যালো অনি, কী হয়েছে রে, সুদীপ্তা ফোন করেছিল তোর বউদিকে, টুইন ছিল?

হ্যাঁ, বড়দা।

একজন কি ?

আজ ডাক্তার তাই বলেছে, আমি যাচ্ছি, গিয়ে তোমাকে জানাচ্ছি।

অনিমেষের দাদা পরমেশ বললেন, খুব রিস্কি হয়ে গেল, তিতলিকে আজই হসপিটালাইজড করতে হবে, বাড়িতে রাখা ঠিক হবে না।

সৌরভের গাড়ি চলছে। অনিমেষের কানে মোবাইল ফোন। পরমেশ বলছেন, এতে মায়ের জীবন ঝুঁকির হয়ে যাবে, আমাকে দুজন বলল, কাউকেই রাখা যাবে না, আমি যাব তিতলির শ্বশুর বাড়ি?

অনিমেষ বলল, আমি পৌঁছই আগে, দরকার পড়লে তোমাকে ডাকব বড়দা।

অনিমেষের দাদা দুইজন। একজন থাকেন বাইরে। সেই মধ্য প্রদেশ, উজ্জয়িনী। সেখানে সেটেল্ড। তারা দুজন কলকাতায়। অনিমেষের বোন দুইটি। তাদের একজন টালিগঞ্জ, অন্যজন বহরমপুর। পরমেশ উচ্চপদাধিকারী ছিলেন। এখনো যোগাযোগ অনেক। বললেন, আমি কি মেডিকায় যোগাযোগ করব ?

করো, আমার মাথায় কিছু আসছে না। বলতে বলতে ঝুঁকে পড়ল অনিমেষ। গাড়ি জ্যামে আটকে আছে। ছটফট করে ওঠে অনিমেষ। ওপারে ফোনে রয়েছেন পরমেশ, পরমেশ বললেন, ডেড ফেটাস ক্যারি করা ফ্যাটাল হয়ে যেতে পারে অনি।

জানি দাদা, আমি বুঝতে পারছি না কী করব।

তুই আমাকে ফোন করিস ওখানে গিয়ে, কেন হল?

জানি না, কী করে জানব?

তুই ডাঃ নিখিল রায়ের সঙ্গে কথা বল, নিখিল বলতে পারবে কী হতে পারে, ২৪ ঘন্টা না আটচল্লিশ কি বাহাত্তর ঘন্টা কত সময় ধরে ক্যারি করছে মেয়েটা ওই মৃত ভ্রূণ?

আমি কিছুই জানি না দাদা।

তুই যা, আমি রাখছি, আমি কথা বলছি অন্য ডাক্তারদের সঙ্গে।

গাড়ি চলছিল আস্তে আস্তে। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ সিগনালে সিগনালে একপা অন্তর গতিতে বেড়ি দিয়ে রেখেছে। পথ কোথাও আলো কোথাও ঝুপসি অন্ধকার। গাড়ির হর্নে সমস্ত নিস্তব্ধতা চূর্ণ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তবে আলো যেন ধোঁয়াশায় ছেয়ে আছে। রাস্তা, রাস্তার ধারের বহুতল, সব মরা আলোয় ঢেকে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। এই শহরের কোথাও, হালভাঙা নাবিকের মতো নিরূপায় একটি মৃত ভ্রুণ শুয়ে আছে মাতৃ গর্ভে। তিতলির কেন এমন হলো ? কত যমজ জন্ম নিচ্ছে এই মুহূর্তে এই শহরে। অনিমেষ ডায়াল করল ডাঃ নিখিল রায়কে। তিনি নাক কান গলার বিশেষজ্ঞ। অনিমেষ বলল, নিখিলদা খুব বিপদে পড়েছি, দাদা বললেন আপনাকে বলতে, কী সাজেস্ট করেন আপনি।

নিখিল রায় শান্ত মানুষ। খুব মন দিয়ে শুনতে শুনতে বললেন, এত নার্ভাস কেন অনিমেষ তুমি, দ্যাখো তুমি এই এই ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পার, আমি আছি একটা বার্থ ডে সেরিমনিতে, আমার ভাইপোর ছেলের পাঁচ হল, আমার গ্র্যান্ড-সান বলতে পারো, তুমি কুশল রায়, জল্লেশ মহাপাত্র বা সলিল জোয়ারদারের সঙ্গে ফোনে কথা বল, আমার রেফারেন্স দাও, ঠিক অ্যাডভাইস পাবে, ওরা সবাই এই কাজে জড়িয়ে আছে, মানুষের জন্ম দেয়, বুঝলে।

নাম্বার তো নেই। অনিমেষ কুণ্ঠিত স্বরে বলল।

নাম্বার পেয়ে যাবে, কী হল আমাকে জানিয়ো। ফোন রাখলেন নিখিল রায়। শেষের দিকে কথাগুলো খুব নিরুত্তাপ হয়ে গেল যেন। অনিমেষ পার হল গিরীশ পার্ক। পথে এখন কত কত লোক। কত কত মানুষ। সবাই জন্মেছে এই পৃথিবীতে। নানা সময়ে জন্মেছে। ভোরে, সকালে, অপরাহ্ণে, রাত্রে। পূর্ণিমায় অমাবস্যায়। কেউ দাঙ্গার সময়, কেউ যুদ্ধের সময়, কেউ নিদারুণ অভাবের দিনে, কেউ কঠিন শীতে, ঘন বর্ষায়, বন্যার ভিতরে, খরায় পোড়া গ্রামখানিতে। কেউ মরেনি, সবাই বেঁচে বর্তে আছে। রোগে আর অপুষ্টিতে মরেছে যত, বেঁচে আছে তার সহস্র সহস্রগুন বেশি।

উফ, অনিমেষ ঘাড় নামিয়ে বসে আছে সৌরভের হুন্ডাই গাড়ির সিটে। একা। ইস, কমলকে নিয়ে এলে হতো। সে কী ভাবে মেয়ের মুখোমুখি হবে? সে কী ভাবে ভোরে কম্পিউটার খুলবে ? ই-মেল যে আপনাআপনি খুলে আসে। অনিমেষ পৌঁছয় রাজবল্লভ পাড়া। গাড়ি রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে সে রাস্তা পার হয়। তারপর গলিপথে প্রবেশ করে। এই গলি বেশ প্রশস্ত। রাস্তায় টিউব-আলোর তেজ না থাকায় প্রশস্ত পথে আলো অন্ধকার।

একটু হেঁটে পাঁচতলা ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে গিয়ে অনিমেষ দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে থাকে। তিতলিরা থাকে চারতলায়। বড় ফ্ল্যাট। তিতলির শ্বশুর মশায় বড় চাকরি করতেন। বছর দুই অবসর নিয়ে কলকাতায় এসে সেটেল্ড হয়েছেন। যখন তিতলির বিয়ের সম্বন্ধ হয় তখন উনি ছিলেন দিল্লি আর অভি পুনে। পুনে থেকে বিয়ের তিনমাস আগে গেল পোর্টব্লেয়ার। এখন এসে যাবে কলকাতায়। আসার আগে ছুটি নিয়ে নিয়ে ফিরছে আর যাচ্ছে। অনিমেষ উপরে তাকায়। তিতলিদের ফ্ল্যাটের আলো কি নিষ্প্রভ ? অনিমেষের এখন তাই মনে হচ্ছে। কলকাতার যে পথ ভেদ করে এল চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরে, সমস্ত পথ সমস্ত শহর কেমন নিষ্প্রভ অনুজ্জ্বল মনে হচ্ছিল। সে যেন দীর্ঘ এক ধুসরতার ভিতর দিয়ে এল এতটা পথ। ঘন ধোঁয়াশায় পথ হয়ে যাচ্ছে অভেদ্য। অনিমেষ এগোয়। কে ? অন্ধকার থেকে যেন কেউ ডাক দেয় তাকে। প্রাচীরের ধারে একটি গাছ। সেখানে এসে বসেছে নাকি সেই বুড়োকাক? অনিমেষ মনে মনে বলে, না হতেও তো পারে, ভুল হতে পারে ডাক্তারের, আজ সকালেই তো তিতলি সাড়া পেয়েছিল তার। অনিমেষ লিফটের ভিতর একা দাঁড়িয়ে জোড় হস্তে নমস্কার করে বিরাট এক শূন্যতাকে। লিফট তাকে টেনে তুলে নিয়ে গেল টপ ফ্লোরে। সে পুশ করে নি ৪ নং বোতাম। অনিমেষ দেখল একজন অতিবৃদ্ধ দাঁড়িয়ে। পাকা দাড়ি চুল, ধুতি আর আদুল গা। তিনি লিফটে উঠবেন। অনিমেষ বেরিয়ে এসে তাঁকে জায়গা করে দিল। তিনি বড় পায়ে উঠে অনিমেষকে বললেন, যাই।

আসুন। অনিমেষ অবাক হয়ে বলল। হেমন্তের এই শীতার্ত সন্ধ্যায় উন্মুক্ত গায়ে উনি কোথায় চললেন ? উনি কে ?

লিফট নেমে গেল। অথবা অনিমেষের সামনেটা শূন্য হয়ে গেল। কেউ একজন ছিল নেমে গেছে। সে সিঁড়ির অন্ধকার বেয়ে নেমে এল নিচের ফ্লোরে। তিতলিদের ফ্ল্যাটের দরজা ভেজান ছিল। অনিমেষ ঢুকে পড়ল। অভির মামা এসেছেন। সুদীপ্তা, তিতির, মাধবী তিতলিকে ঘিরে বসেছে ভিতরের ঘরে। বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছে অনিমেষ। তিতলি কাঁদছিল, তাকে কোনোরকমে শান্ত করেছে ওঁরা তিনজন। মিঃ চন্দ আর অভি নিশ্চুপ। অনিমেষ বসল চেয়ারে, বলল, ভুল হতে পারে তো।

অভি মাথা নিচু করে থাকল। সুজন বললেন, বড় একজন ডাক্তারকে দেখাতে পারলে হত, কাল সকালেই দেখাতে হবে, চেষ্টা করে যাচ্ছি, কিন্তু কন্ট্যাক্ট করতে পারছি না, বড় বড় ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট তিন মাসের আগে পাওয়া কঠিন।

ওর যদি বিপদ হয়। অনিমেষের গলা বুঁজে গেল।

৭২ ঘন্টা কেটে গেছে তো, ডাঃ রায় বললেন, এখনই কিছু হবে না।

অনিমেষ বলল, রাতে বড় কোথাও অ্যাডমিট করিয়ে দিতে বললেন আমার দাদা।

সুজন বললেন, ভয় পাবেন না, ডাঃ রায় বলেছেন মাদারের ভয় নেই আপাতত, কিন্তু একজন গেছে যখন, অন্যকে রাখা কঠিন হবে।

কিন্তু আমার দাদা কথা বলেছেন দুই ডাক্তারের সঙ্গে, তাঁরা বলছেন মাদারের লাইফ রিস্ক হয়ে যেতে পারে।

জানি, কিন্তু আমরা আর একজনের সঙ্গে কথা বলতে চাই, যিনি এই বিষয়টা ডিল করেন।

তখন ফোন হাতে সুদীপ্তা বাইরে এল। ভিতরে বিনবিনে কান্না। এখন আবার আরম্ভ হল। উঠে গেল অনিমেষ। তিতলি তার গলার স্বরে কাঁদছে। অনিমেষ বলল, কাঁদিস কেন, ভুল হতে পারে ভুল ভুল, আর আমাদের কাজ তোকে ভাল রাখা, তুই ভাল থাকিস এমন কিছু করতে হবে তিতলি মা, ভয় নেই, আমরা সবাই আছি।

তিতলি মাথা নিচু করে খুব চাপা গলায় বলল, বাবা আবার মনে হল।

কী মনে হল রে?

সে আছে। বলে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল তিতলি।

সুদীপ্তা ঢুকল, বলল, দিদি অবন্তিকা চক্রর্বতীকে দেখাতে বলছে কাল, বড় গায়নোকলজিস্ট, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে কাল সকাল নটায়।

দিদি মানে অনিমেষের বউদি। সুদীপ্তার ফোনটি এখন মিঃ চন্দর কাছে। তিনি কথা বলছেন। তখন কমল ফোন করল, অনিমেষদা।

ফোন নিয়ে অনিমেষ বাইরে এল, বল কমল।

কী হয়েছে অনিমেষদা?

অনিমেষ কথাটি বলতে বলতে ভেঙে পড়তে লাগল। ঠিকঠাক বোঝাতে পারছিল না। কোনো রকমে বলতে, কমল বলল, দেখুন অনিমেষদা, এখন প্রথম কাজ হল মাদারকে সুস্থ রাখা, তাকে বাঁচিয়ে অন্য কথা ভাবা যাবে, একটা অ্যালাইভ, অন্যটা ডেড, খুব রিস্কি অনিমেষদা।

কী করব?

আমি কি ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করব, মিঃ দস্তিদার বা মহাপাত্র ?

ডাঃ অবন্তিকা চক্রর্বতী দেখবেন কাল সকালে।

দেখুন, কিন্তু খুব বড় ডাক্তারের ওপিনিয়ন নিতে হবে অনিমেষদা, মাদারকে আগে দেখতে হবে, দেন বেবি, ডাঃ দস্তিদার বা মহাপাত্র কলকাতার কেন সমস্ত দেশের সবচেয়ে বড় ডাক্তারদের ভিতর পড়েন, অনেক জটিল কেস তাঁরা সমাধান করেছেন।

কিন্তু যোগাযোগ করব কীভাবে?

আমি দেখছি, আমার বন্ধু সুবীরকে চেনেন নিশ্চয়, ও তো ইন্ডিয়া টাইমসে আছে, ওদের সঙ্গে অনেক যোগাযোগ থাকে, আমি দেখছি অনিমেষদা।

দ্যাখো, আমি কী বলব। অনিমেষ বলল।

সুজন নিম্নস্বরে বললেন, ডাঃ রায় বলেছেন ভয় নেই মায়ের।

অনিমেষ বলল, আর এক ডাক্তার বলছেন রিস্কি।

সুজন চুপ করে থাকলেন।

অনিমেষ বলল, কোথাও ভর্তি করে দিতে হবে মনে হয়।

সুজন এবারও চুপ করে থাকলেন।

অনিমেষ আর কোনো কথা বলল না। আবার একটুবাদে ফোন এল কমলের, বলল, ডাঃ দস্তিদার মুম্বই আছেন, কাল রাতে ফিরবেন, আমরা দেখছি অনিমেষদা, ভয় পাবেন না, তেমন কিছু হলে খবর দেবেন, রাতেই কোনো নারসিং হোমে ভর্তি করে দিলে হত না কি, বাড়িতে রাখবেন?

অনিমেষ বলল, দেখছি।

১৮

দেখছি, বলেছিল অনিমেষ, কিন্তু কিছুই তার করা হল না। অভিরূপ আর ওর বাবা কী চাইছেন বুঝতে পারছিল না সে। ডাঃ দস্তিদার আসতে আগামীকাল রাত, দেখবেন কবে বলা যাবে না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়াই দুরূহ। কমল খুব চেষ্টা করছে। এখন তো উনি এই শহরেই নেই। থাকলে কমল আরো চেষ্টা করতে পারত। এই রাতটা তো যাবে? কী ভাবে যাবে ? তিতলি যেন তারের উপর দিয়ে হাঁটছে। তারা সবাই নিচে দাঁড়িয়ে দেখছে। অনিমেষের ঘুম বারবার ভেঙে যেতে লাগল। সে কম্পিউটার রুমে গিয়ে বসে থাকল। কিন্তু মেল খুলতে পারল না। ভয় করতে লাগল। অন্ধকারে একা বসে কাঁদতে লাগল।

গেল দীর্ঘ সেই রাত। সেই রাত শেষই হয় না। না অনিমেষের না তিতলি, না অভিরূপের না কারোর। তিতলি টের পেল রাত নয় যেন যুদ্ধবিরতির সাময়িক স্তব্ধতা নেমেছে চরাচরে। তার দেহের ভিতরের দুজনের একজন থেমে যাওয়ায় অন্যজন তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে যেন অন্ধকার সমুদ্রে। কোথায় গেলি বন্ধু আমার ধিতাং ধিতাং বোলে...। কালা বৈঠা বেয়ে যাও কোন সওদাগর, আমার ভাইয়ের কাছে কইয়ো খবর।

সেই বাঘ ভল্লুক শিম্পাঞ্জি হনুমান জিরাফ খরগোস তিনদিন ধরে চুপ। যারা কমাস ধরে তাদের নিয়ে খেলে তারা কদিন ধরে আসছে না।

এই তারা কই? একজন জিজ্ঞেস করে।

কে জানে ! অন্যজন জবাব দেয়।

একজন এসেছিল।। শিম্পাঞ্জি বলল।

খরগোস বলল, একা, আর একজনকে বোধ হয় খুঁজতে এসেছিল।

তারপর ?

না পেয়ে চলে গেল। খরগোস বলল।

তাই ! জিরাফ বোল, একসঙ্গে তো আসে ওরা।

শুনতে শুনতে তিতলির মনে হয় বলে, ঘুমিয়ে আছে যে, তাই আসে না। ঘুম ঘোরে এক একবার যেন পাশ ফেরে। স্ক্যান রিপোরটে ভুলই এসেছে। ভুল ভুল ভুল। কাল সকালে অবন্তিকা চক্রর্বতী বলবেন, সব ঠিক আছে, এই এই সোনা, ঘুমোস কেন এত ?

অবন্তিকা ঃ কোনো ভয় নেই তোমার, দুজনেই সুস্থ আছে।

নড়ছে না যে দিদি ?

অবন্তিকাঃ ঘুমিয়ে আছে, ঘুমিয়ে এনারজি নিয়ে আবার দাপাবে।

তাহলে কোনো ভয় নেই?

অবন্তিকাঃ একদম নেই, ঐ স্ক্যান রির্পোটি ভুল।

ভুল হয়?

অবন্তিকাঃ মেসিনে গোলমাল হলে হবে।

মেসিনে গোলমাল হয়?

অবন্তিকাঃ সব সময় না, আচমকা হয়ে যায়, পুরোন মেসিন তো।

তাহলে আমি আর কাঁদব না?

অবন্তিকাঃ না না, একদম না।

এমনি তো হয়। হয়। হয়। হতেই পারে। হওয়াটাই সম্ভব। মালোবুড়োর কথা একদম মনে করব না। সব ভুল। চামেলীদির গল্পের কোনো মানে নেই। কিন্তু টিভিতে দেখাল যে বাংলাদেশে খুব গোলমাল, হরতাল আর হরতাল। আগুন আর আগুন। খবরের কাগজেও তো উঠছে। কিন্তু তার সঙ্গে তিতলির কী সর্ম্পক? তিতলি কোনোদিন বাংলাদেশ দেখেছে? ভৈরব, রূপসা, কপোতাক্ষ, তিতাস, মেঘনা, পদ্মা চেনে সে? বাবার দেশ ছিল, বাবার জন্মও ওইপারে, কিন্তু বাবার দুই বছর হওয়ার পর ১৯৫৪-য় দেশ ছাড়া হয়। বাবার বড় হওয়া এপারে। সব এপারে। ওই দেশ ঠাকুরদার দেশ ছিল বলা যায়। তবে বাবা খুব জন্মভূমির কথা বলে। বাবার দেশ ছিল কপোতাক্ষতীরে। মালোপাড়া ভৈরবের তীরে। না, সব নদীর ধারে মালোবসতি থাকে। সে ভৈরব হোক, তিতাস আর কপোতাক্ষ হোক। কলকাতার বড়বাজারে একটা মালোপাড়া আছে। মিনিবাসের কন্ডাক্টর হাঁকে, মালাপাড়া। সামনেই গঙ্গা। মালোপাড়ায় যাই হোক তাতে তার কী? মালোবুড়ো মরেছে, উফ, কেন ওই কথা নিয়ে চামেলী বিশ্বাস কলকাতায় এসেছিল? মালোবুড়োর কথা কি সে জানত ? তাকে জানাল কেন? যৌবনে মালোবুড়ো মুক্তিযুদ্ধে ছিল। তাকে মুক্তি-বিরোধী দল, রাজাকার কাদের মোল্লার সর্মথকরা পুড়িয়ে মেরেছে। হায় ! যতবার মনে পড়ে সমস্ত শরীর কুঁকড়ে যায়। গা হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায়। মুখ গুঁজে বিছানায় পড়ে থাকে তিতলি।

তখন একজন আবার ডাক দেয়, ও নাইয়া, ধিতাংরে?

কেউ বুঝি দূর এক গহীন গাং থেকে সাড়া দেয় অন্ধকারে, কিন্তু তার কোনো কথা শোনা যায় না। বোঝা যায় না। অকূল গাঙে অন্ধকারে ভেসে গেছে সে। তার গলার

স্বরও হারিয়ে যায় নোনা গাঙের হাওয়ায়। তার সামনে অন্তহীন কৃষ্ণপক্ষ। চাঁদ তারা ছিল না আকাশে। সমস্ত আলো শুষে নিয়েছে নোনা জল। শুষে নিয়ে সেই জল ভাটির দেশে চলে গিয়ে গাং শূন্য করে গেছে। নাও মুখ থুবড়ে পড়েছে শুষ্ক চরাচর আর জলহীন গাঙে।

পরদিন সকাল ছিল মেঘলা। রোদ ছিল না। সমস্ত রাত ধরে আকাশ বিষাদ মেঘে আচ্ছন্ন হয়েছে। পুবের বাতাস বইছিল। বৃষ্টি হলেও হতে পারে। ডাঃ অবন্তিকা চক্রর্বতীর চেম্বারে কতলোক। অনিমেষের দাদা বউদিও এসেছেন। অনিমেষরা তিনজন, তিতলিরা চারজন। তিতলি ভিতরে গেল।। অনিমেষরা বাইরে। সেই অপেক্ষার শেষ নেই। তারপর ডাক পড়ল অভিরূপের। অভিরূপ গেল ডক্টর'স রুমে। বাইরে সবাই। অনিমেষ রাস্তায় পায়চারী করছিল। মিনিট পনের বাদে তিতির ছুটে এল, বাবা বাবা।

অনিমেষ ভিতরে ঢুকে দেখল তিতলি তার মায়ের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদছে। যা শোনার সে শুনে এসেছে। অনিমেষ, পরমেশ আর সুজনকে নিয়ে বির্মষ অভিরূপ ভিতরে গেল। তিনি বছর পঞ্চাশ। অবন্তিকার হাতে স্ক্যান রির্পোর্ট। গৌরী তিনি। মুখখানি স্নিগ্ধ। মাথার চুলে অল্প পাক ধরেছে। তাদের বসতে বললেন। তাঁর হাতে অনেক মানুষের জন্ম হয়েছে। কতমানুষের জন্মে কত বিপত্তি। সব সামলেছেন তিনি। বললেন, খুব খারাপ লাগছে আমার, খুব কষ্ট হচ্ছে, ভাল কথা শোনাতে পারছি না, আয়াম স্যরি।

অনিমেষ বলল, আমরা তো জেনেই এসেছি, আপনি কী করতে বলছেন।

অবন্তিকা বললেন, স্যরি, যে আছে তাকেও রাখা যাবে না, রিস্ক হয়ে যাবে, অবিলম্বে দুটোকেই নষ্ট করে ফেলতে হবে, ফাইভ মান্থস ফেটাস, বড় কোথাও যোগাযোগ করুন, চার দিন হয়ে গেছে, এখন যদি মৃতের সঙ্গে জীবিত যদি বেরিয়ে আসে, আর তা আসবেই, তখন মায়ের প্রাণ সংশয় হবে, দু-তিন দিনের ভিতর সব কিছু করে ফেলতে হবে, কোনো মায়া রাখা যাবে না, ডেঞ্জারাস হয়ে যাবে সবটা ক্রমশ।

অনিমেষের মাথা ঝুঁকে পড়ল। পরমেশ জিজ্ঞেস করছিলেন আরো কিছু। সুজনও। অনিমেষ কোনো কথা শুনতে পাচ্ছিল না। তারপর একসময় তারা বেরিয়ে এল। বেরিয়ে আসার পর পরমেশ বললেন, এখনই কোথাও অ্যাডমিট করাতে নিয়ে যাবে অভিরূপ?

অভিরূপ বলল, আপনারা যা বলবেন, যে বেঁচে আছে সেও থাকবে না ! কান্না ঝরে পড়ল অভিরূপের গলা থেকে। চোখ জলে র্ভতি হয়ে গেছে। সে তো প্রথম পিতৃত্বের স্বাদ পেতে যাচ্ছিল। কতদিন তিতলির পেটে কান দিয়ে শুনেছে প্রাণ স্পন্দন। যে বেঁচে আছে তার স্পন্দন শুনেছে গতরাতেও। অভিরূপ বলল, ডাক্তার তো তিনদিন টাইম দিলেন, আর একজনের সাজেশন নেওয়া যায় না কি?

সাজেশন কী আর নেবে, মৃত ভ্রূণ রাখা খুব ঝুঁকির, মেয়েটার যদি বিপদ হয়। পরমেশ বলেন।

তাহলে আপনারা যা বলবেন, তিতলির যেন কোনো বিপদ না হয়। অভিরূপ বলে।

তারা যখন এইসব কথা বলছিল বাইরে এসে, তিতলি যখন হাউহাউ করে কাঁদছিল তার মাকে জড়িয়ে, তখন বেলা সাড়ে এগার। কমলের ফোন এল, অনিমেষদা আপনি কোথায়?

অনিমেষ ভেঙে পড়ে বলল, অন্যটাকেও রাখা যাবে না।

অনিমেষদা মাথা ঠান্ডা রাখুন, ডাঃ দস্তিদারের সঙ্গে কথা হয়েছে, তিনি আজ রাতে ফিরবেন মুম্বই থেকে, কাল সকাল নটায় দেখবেন, উনি নিজে হাতে সারজারি করেন, যা করার ওঁর হাতেই করাবেন, তাহলে মাদার সেফ থাকবে, এটা খুব রিস্কি কেস, ওঁর চেম্বার গুরুসদয় রোডে, ‘জন্ম’, আপনারা কঘন্টা ওয়েট করুন, পাঁচমাসে হাত পা হয়ে যায়, চোখের রেখা ফোটে, ইস, দেখুন উনি কী বলেন।

কী বলছ তুমি কমল? অনিমেষের বুক ভেঙে যেতে লাগল, চোখ ফুটে যায়!

হ্যাঁ, মানুষের শেপে চলে আসে।

তাহলে কী করে নষ্ট করব, যে আসতে চাইছে, তাকে আসতে দেব না?

কমল বলল, আপনাকে স্থির হতে হবে, প্রথমে তিতলি, তারপর...।

তারপর কত কথা হয়। রাখা যাবে না বলেই দিয়েছেন অবন্তিকা। তিতলিকে বাঁচাতে হবে তো। তিতলিকে নিয়ে অভিরূপ আর সুজন চন্দ চলে যান। পরেরদিন ডাঃ দস্তিদারকে দেখিয়ে ওঁর হাতেই যা করার করা হবে। দুপুর যায় সন্ধ্যা যায় রাত্রি হয়। সমস্তদিন ধরে মেঘের ভার বেড়েছে আকাশে। এলোমেলো বাতাসের শোঁ শোঁ শোনা যায়। তখন অভিরূপ বলে, একবার শুনব।

কী শুনবে, শুনে কী হবে, ওকে তো রাখতে পারব না। চোখ মুছল তিতলি।

ওর লাবডুব শুনি তিতলি। অভিরূপ অস্ফূট স্বরে বলল।

না, ওরা কেউ যদি না থাকবে, তবে এল কেন?

অভিরূপ বলল, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

কী বিশ্বাস হচ্ছে না?

অভিরূপ বলল, জানি না তিতলি, জানি না, আমি বুঝতে পারছি না কী করা উচিৎ আমার।

তিতলি ফুঁপিয়ে উঠে বলল, দুজনে এসেছিল, একা চলে গেল একজন, আর অন্যটাকে আমি একা যেতে দেব না।

কী বলছ তিতলি! অভিরূপ তাকে আগলে নিল, চোখের জল মুছিয়ে বলল, একবার শুনতে দাও ওর বুকের শব্দ। একবার শুনি, ও আমাদের কাছে আসতে চায় তো। অভিরূপ নিজেও কেঁদে ফেলল। নিঃশব্দ সেই কান্না। সে তার সন্তানের মাতৃগর্ভে কান পাতে। সে নড়ছে, টের পায় অভিরূপ। অভিরূপের মনে হয় ও বোধ হয় জেনে গেছে। খুব

নড়ছে। তিতলি বলে, তুমি কান সরাও অভি, দাপাচ্ছে যেন, সব জেনে গেছে, হা ভগবান, না রাখতে পারব তো দিলে কেন, না থাকবি তো এলি কেন?

বাইরে বৃষ্টি নামল বোধ হয়। স্বামী স্ত্রী পরস্পরে সংলগ্ন হয়ে শুয়ে থাকে। ঘুমিয়ে পড়ে আবার জেগে ওঠে। আবার ঘুমোয়। রাত গহীন হয়। সে বেরিয়ে আসে অন্ধকারে। তিতলির ছোটবেলার খরগোস ঘরের কোনে মন খারাপ করে বসেছিল, তার কাছে টলোমলো পায়ে যায় ঝিলমিল, জিজ্ঞেস করে, তাকে দেখেছ ?

না তো।

কোথায় গেল সে?

খরগোস তার গায়ে হাত বুলোয়, বলে, তুমি কিছু জান না ?

না তো, কী জানব? সে অবাক।

কেন তোমরা না এক সঙ্গে থাকো ? খরগোস জিজ্ঞেস করে।

আলাদা ঘরে গো। সে জবাব দেয়।

তাকে ডাকো না ।

বুঝতে পারছি না গো। সে বলে, তোমাদের আর সবাই কই?

খরগোস বলে, আমি একা জেগে আছি, বাকিরা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়েছে।

কাঁদতে কাঁদতে মানে?

কান্না ছিল যে, চোখে।

কান্না কী ? সে জিজ্ঞেস করে।

হা ভগবান, তুমি কান্না জান না?

কী জানি, হয় তো জানি না।

খরগোস বলে, সবাই আমরা কাঁদছিলাম।

কেন কী হয়েছে? সে জিজ্ঞেস করে, কাঁদছে কেন?

তা তো জানি না। খরগোস বলে।

তুমি কাঁদ নি ?

হ্যাঁ, কেঁদেছি।

কেন গো কী হয়েছিল?

খরগোস বলে, জানি না, সবাই কাঁদছিল তাই কেঁদেছি, এই তো তুমি, এই তোমাকে একটু ভালবাসা দি।

দাও, ভালবাসা কেমন গো ?

খরগোস বলে, ভালবাসায় সব হয় গো।

কী হয়?

খরগোস বলে, তোমাকে ভালবাসা দেব বলে আমি বসে আছি একা, কাঁদতে কাঁদতে ঘুমোই নি।

দাও দাও, সে কি মালোবুড়োর কাছে ফিরে গেল?

জানি না, আমি তোমায় ভালবাসি, এস সোনা, তুমি থাকলে আমরা খেলতে পারব, না হলে জগতের যত খেলনা পুতুল, কেউ থাকবে না।

তাই, আমি তো আছি।

থাকো সোনা। বলে খরগোস চোখ মুছল।

এই তুমি কানছ কেন?

আনন্দে সোনা আনন্দে, ভালবাসায় কান্না আসে যে। খরগোস বলে।

এবার আমি মায়ের কাছে ফিরি। সে বলল।

এস, আবার এস, আমি তোমায় অনেক ভালবাসাদি, তুমি আবার এস, জন্মে জন্মে এস, আমরা তোমায় ছাড়া অচল, যাও সোনা যাও, মায়ের ভিতরে যাও, মাকে আঁকড়ে থাকো, জড়িয়ে থাকো।

সে ফিরে গেল। খরগোস নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। আর কি হবে দেখা ? ওকে নষ্ট করতে কাল ওরা যাবে আর এক ডাক্তারের কাছে, তা শুনেই তো কেঁদেছে সবাই, বনের বাঘ শিম্পাঞ্জি থেকে লোকালয়ের খরগোস, কুকুর আর ভুল করে উড়ে আসা ম্যাকাও পাখিটি পর্যন্ত। বাইরে আকাশ থেকে ফোটা ফোটা জল নামছিল।

পরদিন সকালে আকাশ থম মেরে ছিল। রাস্তাঘাট, পথের ধারের গাছ-গাছালি ভিজে। ডাঃ দস্তিদারের চেম্বারে অনিমেষ আর সুদীপ্তা আগে পৌঁছে গেছে। একটু বাদে তিতলি, অভি আর অভির বাবার সঙ্গে। কলকাতা কোলাহলময় এক শহর। যত বেলা হয়, ততো জেগে ওঠে। কিন্তু ‘জন্ম’ নামের এই ক্লিনিক যেখানে, সেই গুরুসদয় রোড সমস্তদিনই থাকে নিস্তব্ধ। নিঃশব্দে গাড়ি যায় গাড়ি আসে, মানুষ চলে মানুষ ফেরে। তিতলির চোখের জল এখন শুকিয়েছে, নদী যেমন শুকায়। তার বাবা বাংলাদেশের বন্ধুর কাছে শুনেছে কপোতাক্ষ নদ শুকিয়ে ধু-ধু হয়ে গেছে। নদীর উপর দিয়ে আড়াআড়ি বাঁধের রাস্তা হয়ে গেছে। তিতলির মনে হচ্ছে সে তার সারাজীবনের কান্না শেষরাত থেকে কেঁদে ফুরিয়ে ফেলেছে। আর জল আসবে না চোখে। তখন সেই জীবিত প্রাণ টলমল করছিল যেন তার হৃদয়জুড়ে। ছোট ছোট পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। তার পেটে ধাক্কা মারছিল বারেবারে। মা মা মা......ডাকছিল যেন। মা কেঁদ না, আমি আবার আসব। মা আমি তোমার। আমাকে তোমার ভিতরে রেখে দাও। তিতলি কেন, অভি, অভির বাবা কেউ কথা বলছেন না।

চেম্বারে পৌঁছে অনিমেষ তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা বলতে রিসেপশনের কন্যাটি বলল, হ্যাঁ, আপনাদের কথা বলা আছে, পেশেন্ট?

ওই এসে গেছে। সুদীপ্তা দেখল তিতলি অভিরা ঢুকছে। অভির হাত ধরে আছে তিতলি। আর তখনই ভিতর থেকে বেরিয়ে এল যে, তাকে দেখে অনিমেষ অবাক। শান্তাদি ! বছর পঁচিশের যে কন্যাটি এই ক্লিনিকের ইউনির্ফম, নীলরঙের শালোয়ার কামিজ পরে হাসতে হাসতে এসে দাঁড়াল রিসেপশনে, সে অবিকল সেই স্নেহময়ী শান্তাদি। তার জেঠার মেয়ে। তার চেয়ে বছর দশের বড় হবে। হিসেবে শান্তাদি এখন সত্তর পার। বুড়ি হয়ে গেছে নিশ্চিত। শান্তাদির বিয়ে হয়েছিল বহরমপুর। জেঠা ছিলেন বাবার খুড়তুতো ভাই। তাদের ছেলেবেলায় খুব যোগাযোগ ছিল, তখন তো সবাই ওপার থেকে আসা। তার বছর পনের পর্যন্ত ছিল যোগাযোগ। শান্তাদির বিয়ের পর আর দেখা হয় নি। জেঠা মারা যান যখন, সে বাইরে। অবিকল শান্তাদি। সেই হাসি। সেই উজ্জ্বলতা। ইউনির্ফর্মের উপর ওর নাম লেখা র্কাড। ওর নাম জুলি আকতার। না, সে যা ভেবেছিল তা নয়। সে এগিয়ে এসে বলল, তিতলি কই, তিতলি চন্দ। বলতে বলতে সে নিজেই শনাক্ত করল তিতলিকে, ও তুমি তিতলি, এস, কোনো ভয় নেই, স্যার সক্কালে এসে সব বলে দিয়েছেন। তার

তিতলি তার হাত ধরল। সে তিতলিকে নিয়ে চলল। তিতলি যেতে যেতে বলল, আমার টুইন কিন্তু দিদি।

হাসে জলি আকতার,জিজ্ঞেস করল, প্রথম?

তিতলি ঘাড় হেলাতে সে বলল, ভয় নেই, স্যারের কাছে এসেছ তো।

১৯

শান্তাদি, তুমি! তুমি কোথা থেকে এলে ? মনে মনে বিড়বিড় করে অনিমেষ। জীবন এত বিস্ময়ে ভরা থাকে ? ৪০-৪৫ বছর আগের শান্তাদি সেই ভালবাসা নিয়ে এখানে অপেক্ষা করছেন। তিতলি তোর মেয়ে অনি, আমি ওর হাত ধরছি।

এই ক্লিনিক খুব নামী। ডাঃ দস্তিদারের খ্যাতি মানুষের জন্মের পথ মসৃণ করে দেওয়াতে। সন্তানহীন নারীর কোলে সন্তান এনে দেওয়া তাঁর ব্রত। ক্লিনিক ক্রমশ ভরে উঠছে র্গভবতী নারীতে। তারা এসেছে নৈহাটি, ভাটপাড়া, কল্যানী, রাণাঘাট, চাঁপাডাঙা, এমন কী শিলিগুড়ি, হলদিবাড়ি, দীনহাটা থেকে। তিতলি ভিতরে গেছে। তার হাত ধরে নিয়ে গেল শান্তাদি। তার হাসিতে, কথায় স্নেহ ঝরে পড়ত। খুব ভালবাসত অনিমেষকে। অনিমেষের মনে হল সে একবার বেলেঘাটা যাবে। সেখানে তার সেই জেঠতুতো দাদারা কেউ কেউ থাকে। খোঁজ নেবে শান্তাদির। সেই পঁচিশের শান্তাদি এই ক্লিনিকে। অনিমেষের ষাট পার। এই ডাক্তার দেখে ঠিক করবেন কবে কোথায় অ্যাবোরট করা হবে। কবে অ্যাডমিশন হবে ? যাই হোক না কেন, মৃতের সঙ্গে জীবিতকে নষ্ট না করলে তো মা বাঁচবে না, জীবিত প্রাণও থাকবে না।

অনিমেষ ও সুজন চন্দ বসে আছে। দাঁড়িয়ে আছে অভি। সুদীপ্তা অভির পাশে। রিসেপশনের সামনে পরপর চেয়ারে মা হতে যাওয়া নারীরা। কেউ কেউ বিপুল র্গভভারে ক্লান্ত। খুব তাড়াতাড়ি মা হয়ে যাবে। তাদের যুবক স্বামী উদ্বিগ্ন হয়ে বসে আছে। তিতলির অনেক এগজামিন হচ্ছে। মিনিট পঁয়তাল্লিশ বাদে তাকে নিয়ে এল জুলি আকতার। হেসে অভিকে বলল, ওয়েট করুন, স্যারের কাছে রির্পোট নিয়ে গেছেন আর এক স্যার, আপনাদের ডেকে নেবে।

অনিমেষ বিস্মিত হয়ে তার কণ্ঠস্বর শুনছিল। সেই শান্তাদি। আর এক র্গভবতীকে নিয়ে চলল সে ভিতরে। চুপ করে আছে তিতলি। সময় আর যেতেই চায় না। অনিমেষ ডাক্তারের চেম্বারের দিকে তৃর্ষ্ণাত নয়নে তাকিয়ে ছিল। কখন তিনি ডাকবেন। ডাক এল। একজন স্বাস্থ্যর্কমী সেই চেম্বারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ডাকল, তিতলি চন্দ, বাড়ির লোকও আসবেন। বুক দুরুদুরু করে উঠল অনিমেষের। তারা সকলেই রওনা হলো ডাক্তারের ঘরের দিকে। স্প্রিং ডোর টেনে দাঁড়িয়ে আছে র্শীণকায়া যুবতীটি।

ডাঃ সির্দ্ধাথ দস্তিদারকে আগে চিনত না অনিমেষ। এই প্রথম দেখল। বছর পঞ্চাশ। মাথায় চুল কমে এসেছে। ছ'ফুটের মতো লম্বা, আধময়লা রঙ। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। মুখখানিতে স্মিত হাসি। তাদের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করলেন। তারপর তিতলি, অভিকে ডাকলেন নিজের টেবিলের উল্টোদিকের চেয়ারে। অনিমেষরা বসেছে ঘরের দেওয়াল ঘেষে রাখা সোফায়। অনিমেষের বুক ধকধক করছে। মাথা নিচু করল সে। তাকাতে পারছে না সে। ডাঃ দস্তিদার পুরোন সব রির্পোট দেখছেন গম্ভীর মুখে। তাঁর পাশেই এক তরুণী চিকিৎসক বসে আছেন। তিনি একটির পর একটি রির্পোট তুলে দিচ্ছেন স্যারের হাতে। ডাক্তার বললেন, আপনারা তো সব জানেন, দুটি ফেটাস আছে উপরে নিচে, নিচেরটার র্হাট বিট নেই, ডেড।

অনিমেষ তাকিয়ে আছে ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার বললেন, ভেরি স্যাড, মায়ের কাছে খুব কষ্টের, আর টোয়েন্টি উইকসের ভ্রূণ, সে মানুষের গড়ন পেয়ে গিয়েছিল।

তিতলি মাথা নিচু করে নিজেকে সামলাচ্ছে। অনিমেষ বলল, কেন হল এমন?

নানা কারণে হয়, এমন হতে পারে সে বাঁচতে আসে নি, উইক ছিল, সে জন্মালে একটি অসুস্থ সন্তান জন্মাত, ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল না তাকে আসতে দেওয়া, তুমি মা হতে যাচ্ছ, তুমি কি চাইতে তোমার একজন সুস্থ অন্যজন অসুস্থ হয়ে জন্মাবে ?

সে কি তাই ছিল, সত্যি ? তিতলি মাথা উচু করল, বুঝি নি তো।

ডাক্তার বললেন, না হলে সে থেমে যাবে কেন?

অনিমেষ বুঝতে পারছিল না কী বলবে। তারা তো এসেছে তিতলির জীবন বাঁচাতে। ডাক্তারের কথায় ঈশ্বর এলেন। কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় কী? যে সুস্থ আছে তাকে তো নষ্ট করে দিতে হবে। একটির প্রাণ ঈশ্বর নিলেন, অন্যটির নেবে মানুষ। আসলে ঈশ্বরই

নেবেন। মানুষের যা করতে হয়, তা কি ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়? ইশ্বর দু'জনের প্রাণ নেবেন তো তাদের এনেছিলেন কেন? ডাক্তার চুপ করে সময় নিচ্ছেন চিন্তার। ঘর নিস্তব্ধ হয়ে আছে। ডাক্তারই সেই স্তব্ধতার ভিতরে হয় তো তাদের দিক থেকে কোনো কথা শুনতে চাইছিলেন। অনিমেষ বলল, আমরা আপনার কাছে এসেছি, আমাদের মেয়েটিকে বাঁচাতে হবে তো।

নিশ্চয়, কিন্তু আমাকে একটা বেলা সময় দিতে হবে, আমি একা কোনো সিদ্ধান্ত নেব না, এই বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ, তাঁদের সঙ্গে কথা বলব।

তাহলে?

আপনারা বিকেলে আসুন, চারটের পর, আমি দুপুরে সকলের সঙ্গে কথা বলব, আসলে ঈশ্বর এখন আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন, উই শুড ডু ইন অ্যাকোরডান্স উইথ হিস উইশ, ঈশ্বরের অভিপ্রায় কী জানতে হবে, বিকেলে আসুন।

বেরিয়ে আসার মুখে অনিমেষ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ডাক্তারবাবু, ও আপনারই মেয়ে হলে যা করতেন, তাই করবেন, আমরা সারেন্ডার করলাম। বলতে বলতে তার গলা বুঁজে গেল।

আসুন ওবেলা। ডাক্তারের সংক্ষিপ্ত জবাব। মাথা নামিয়ে আছেন তিনি, বিড়বিড় করলেন ডাক্তার, আমি তো জন্মের ব্যবস্থা করি, আমি জন্মের কথাই তো ভাবব।

সেই দুপুর ছিল শহরের সেরা ডাক্তারের মতো নতমস্তক বিষাদে ডুবে। শহরের কোথাও ছিল না আনন্দের কোনো চিহ্ন। সারাটা পথ সকলে চুপ। কেউ কারোর দিকে তাকাচ্ছে না। রোদ ছিল না, আবার ছায়াও নয়। ক্লান্ত শহর যেন ধুঁকছে। ধাপার আকাশের শকুনেরা নেমে আসছিল শহরের কোনো কোনো গাছে। কিছু একটা টের পেয়েছে তারা। বাড়ি ফিরে অনিমেষ কয়েকটি ফোন করল। কমলকে জানাল সকালের কথা। দাদা পরমেশকে জানাল। তারপর তিনটে বাজতে ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তখনো শহরের আকাশ তেমনই মেঘলা। প্রায় তাদের সঙ্গেই পৌঁছল তিতলি, অভি, সুজন চন্দ। ঠিক চারটের সময় সেই জলি আকতার এসে ডাকল তাদের, তিতলি চন্দ, তিতলি এস, স্যার সকলের জন্য অপেক্ষা করছেন।

তারা ভিতরে ঢুকতে ডাক্তার স্মিত হেসে তাদের বসতে বললেন। সকলের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, দেখুন আমি আজ দুপুরে এই বিষয়ে যাঁরা প্রায় ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি, আপনারা কেন এসেছেন আগে বলুন।

সুজন বললেন, আমার পুত্রবধূ, আমার কন্যাই, আমরা ওর কোনো বিপদ হয় চাই না, আগে ওকে সেভ করুন ডাক্তারবাবু, তার জন্য যদি যে আছে সে না থাকে, আমরা মেনে নেব, যা হবে, আপনার হাতেই হবে।

ডাক্তার বললেন, দেখুন আমি পাঁচ ডক্তারের সঙ্গে আলাপ করেছি, তাঁদের নাম..., এই যে ঘটনাটি ঘটেছে তাতে যে ভ্রূণটি সুস্থ আছে, সে একেবারেই র্নমাল, প্রাণময়। গত

কুড়ি সপ্তাহে যে গ্রোথ হওয়ার কথা, তাই হয়েছে, তাকে আমরা ফেলব কী করে, সে আসতে চায়, তাকে আমরা কী করে না আসতে দিই ?

কেউ কোনো কথা বলছিল না। ডাক্তারের কথার ভিতরে প্রবেশ করা যেন দুঃসাধ্য। ডাক্তার বললেন, দেখুন এই ঘটনাটি খুব জটিল হয়ে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত কোথায় একটা আলোর রেখা আছে। সেই রেখাটিই ঈশ্বরের করুণা। দুজনে দুটি প্লাসেন্টায় জন্মেছে, দু'জনের ভিতরে একটি মেমব্রেন আছে, যা একের সঙ্গে অন্যকে স্পর্শ করতে দেয় নি। এখন জীবিতের সঙ্গে মৃতের কোনো সরাসরি যোগ নেই। যোগ হত যদি একটি প্লাসেন্টায় দুজনে জন্মাত, তাই-ই হয় বেশিরভাগ, কিন্তু তা হয় নি যখন, যে বেঁচে আছে তাকে রাখা যায়, সে কিন্তু নিজের মতো আছে।

মাদার ? অস্ফূটস্বরে জিজ্ঞেস করে অনিমেষ।

মাদারের কথা ভেবেই বলছি, মায়ের কোনো বিপদ নেই, মা সর্ম্পূণ নিরাপদ। ডাক্তার বললেন, যে আসতে চায় তাকে আনাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়, সে আসবে।

যে চলে গেল? অনিমেষের কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। চোখ ভার হয়ে গেল।

যে থাকল না, সে হয় তো থাকতে আসে নি, কমজোরি হয়ে জন্মে কদিন বাদে চলে যেত, যেতই, তখন কী হতো, তার কথা ভুলে যান, যে আছে তাকে আমরা রাখব, এইটা পসিবল, শতকরা ৯৯ভাগ সে আসবে, তবে একটা চান্স থাকতে পারে, মৃত ভ্রূণ যদি বেরিয়ে আসতে চায়, তখন দুজনেই বেরিয়ে আসবে, আর তাহলে মা সেফ থাকবে, কিন্তু যে বেঁচে আছে সেও আর থাকবে না।

ডাক্তার বলতে বলতে থামলেন, ঘরে দাঁড়ান জলি আক্তারকে ডাকলেন, প্রেসকৃপসনের ওষুধগুলো বুঝিয়ে দাও, ব্লাড নিয়ে নাও, টেস্টগুলো করে ফেল, ঠিক পনেরদিন বাদে একটা ডেট করে দাও, হেল্প লাইন আছে আমাদের সকাল বিকেল রাত, যখন প্রয়োজন পড়ে ফোন করবেন।

তাহলে সে আসবে ? অভিভূত সুজন চন্দ ও অনিমেষ একসঙ্গে উচ্চারণ করল।

জোড়া কথা, সুতরাং আসবে আসবে। ডাক্তার হাসলেন, তিতলির এবার ভার আমি নিলাম, আনন্দে থেক, পৃথিবীতে যত ঘটনা প্রতিদিন ঘটে, দুঃখের ঘটনাগুলো জানিয়ে দেওয়া হয়, শক্তিশালী মিডিয়া আমাদের সব সময় দুঃখের কথা, অন্যায়ের কথা শোনায়, সেইটাই তাদের কাজ, কিন্তু এটা মনে রাখবে, পৃথিবীতে প্রতিদিন আনন্দময় ঘটনা ঘটে অগণিত, কত মানুষ হাসে, আসলে এই পৃথিবী আনন্দের, যে আসবে সে আনন্দময় পৃথিবীতে আসুক, দু;খকে ঠেলে সরিয়ে দাও তিতলি।

অনিমেষ দেখল জলি আকতার, তার শান্তাদি হাসছে। তিতলি আর অভির চোখে জল। তিতলি অভির কানে কানে বলল, মালোবুড়ো, এমনি, ঠিক এমনি, এই মানুষটি সেই মালোবুড়ো যেন একেবারে।

তুমি দেখেছ তাকে? অভি জিজ্ঞেস করে।

না, এই প্রথম। তিতলি বলল, এই তো সামনে বসে।

অনিমেষের মনে হলো, তিতলির কথায় শহরের সমস্ত মুখে হাসি ফুটল।

তখন তিতলি জিজ্ঞেস করল, যে নেই সে থাকবে আমার ভিতরে ?

ডাক্তার মুখ নিচু করলেন, বললেন,তাকে এখন বের করা যাবে না, থাকবে, কিন্তু ক্রমশ সে শুকিয়ে যাবে, ফ্লুইড তো ফুরিয়ে যাবে।

সমুদ্রজল?

হ্যাঁ সমুদ্রজল, ওই রকম স্যালাইন ওয়াটারের ভিতরেই পৃথিবীর প্রথম প্রাণ, জীবকোষের জন্ম হয়েছিল, ওই রকম সমুদ্রেই আমরা জন্মাই, মাদার হল এই পৃথিবীর মতো, পৃথিবীর মতোই সে নিজের ভিতরে ধারণ করে সমুদ্র, জল শুকিয়ে গেলে সেই মৃত ভ্রূণ শুকিয়ে শুকনো পাতার মতো হয়ে যাবে, এখন সে শুকোবে, তোমার ভয় নেই মা।

ডক্টর'স রুম থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে তিতলির আচমকা মনে হল যে থেমে গেছে সে যেন সাড়া দিল। নড়ল। ডাক দিল, মা।

সে দাঁড়াল, তার পাশে পাশে হাঁটা জলি আকতারকে বলল, দিদি, আমি যেন ফিল করলাম।

জলি অবাক, কী ফিল করলে?

তাকে।

তার মানে?

সে পাশ ফিরল। তিতলি বিনবিন করে বলে, সে কি আছে?

জলি ঘুরে গেল, স্যারকে বলো।

তিতলি ঘুরে ডাক্তারের দিকে ফিরল, স্যার।

তুমি ফিল করলে?

ইয়েস স্যার, সে আছে, আছে মনে হয়, গভীর ঘুমে আছে মনে হয়।

এখন ফিল করলে?

ইয়েস স্যার।

ডাক্তার বললেন, আমরা জেনে গেছি সে নেই, কিন্তু ছিল তো অনেকটা দিন, ২০ সপ্তাহ কম নয়।

তিতলি বলল, কিন্তু যদি সে থাকে স্যার?

তাই মনে হবে, ছিল তো, সেই টাচটা অনেকদিন থেকে যাবে, এই কষ্টটা তোমাকে নিতে হবে। বলতে বলতে ডাক্তারের গলার স্বর বুঁজে গেল।

তারা যখন ফিরছে, কলকাতা শহর আলো ঝলমল। অন্ধকার বার বার আলোয় পিছলে পড়ছিল। তিতলি যেন ঘুমের ঘোরে চুপ করে ছিল। সে ভাবছিল কতদিন,

সমস্তজীবন থেকে যাবে সেই স্পর্শ। জীবিত অনেক সময় বাদে একবার নড়ল। নড়তে থাকল। সে খুঁজছিল হয়তো আর একজনকে। ধলা বৈঠা নিয়ে বাও, কোন সদাগর......। নাওয়ের একটা দিক শূন্য হয়ে গেছে। গহীন গাঙে এসেছিল দুইজন, এখন একা। একা পাড়ি দেবে এই মহাসিন্ধু।

তারপর কতদিন গেল। আরো চার মাস। চার মাসে সে রাতের অন্ধকারে কতদিন বেরিয়ে এসেছে। ঘরের কোনে গিয়ে সেই খরগোসের কাছে খোঁজ করেছে, দেখেছ তাকে?

না, আসে নি তো।

মনে পড়ে যে তাকে, কী যে করি আমি।

খরগোস বলে, কী করবে, যদি আসে বলে দেব, খেলবে এখন?

না, দেখি তাকে খুঁজি গিয়ে। বলে সে টলোমলো পায়ে অন্ধকারে চলে যায়।

দিন যায়। তিতলি অপেক্ষা করতে থাকে। এক একদিন আচমকা যেন তাকে অনুভব করে ঘুমের ভিতর, স্বপ্নে জাগরণে। একদিন মধ্যরাতে তার ঘুম ভেঙে গেল কার ডাকে, কে ডাকছে, কে তুমি?

মা আমি, তোমার ভিতরে আছি।

থাকো।

সমুদ্র শুকিয়ে যাচ্ছে মা?

ওরে, তুই তুই তুই, আছিস? কেঁদে ওঠে তিতলি ঘুমঘোরে। অভি জেগে ওঠে, তাকে ডাক দেয়, তিতলি তিতলি।

তিতলি চোখ মেলে চুপ করে থাকে, তারপর বলল, তাকে ফিল কর লাম।

অভি বলল, ঘুমোও তিতলি, যে আসার নয় সে আসে নি।

সে আমাকে স্বপ্ন দিল যে। বিনবিনিয়ে বলল তিতলি।

তার কথা ভুলে যাও তিতলি।

ভুলেই তো যাব অভি, কিন্তু ভুলতে যদি না দেয় সে, কোন সমুদ্দুরে ডুব দিল, মুখ তোলে যখন তখন।

অভি তাকে নিজের কাছে টেনে নিল, বলল, যে আসছে, থেকে গেছে যে, তাকে মনে কর তিতলি, যে নেই, তাকে ভুলে যাও।

তিতলি কান্নায় ভেঙে পড়ে, তাকে যে নিজের ভিতরে রেখে দিয়েছি অভি, এখনো মনে হয়, সে গভীর ঘুমে ডুবে আছে।

২০

তিতলি বোঝে সে ফেলে গেছে তার ছোঁয়া। ছোঁয়া আসে আবার মিলিয়ে যায়। মিলিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে ছয় ঋতুর একের মতো, মেঘের মতো, বৃষ্টির মতো, রোদের মতো, উষাকাল আর অপরাহ্ণের মতো। আসে যায়। যেতে যেতে ফুরোয়। আর তিতলির বাবা অনিমেষ সেই মেইল বক্স আর খোলে না। কিন্তু একদিন ইউ টিউব সার্চ করতে গিয়ে পেয়ে গেল সেই গান। মহীন বসুর গান।

'তুমি না বলে চলিয়া গিয়াছ, নামিছে অন্ধকার।' মাড়োয়া রাগে এর সুর। শুনতে শুনতে আচমকা বন্ধ করে দিল অনিমেষ। নাহ, যে আছে সে আনন্দ নিয়ে আসবেই আসবে। ভোরের কাকটি যে আর নেই তা সে টের পায়। বুড়োকাক কবে উড়াল দিল কে জানে। এখন শুধু অপেক্ষার। মাসে দুবার যেতে হয় সেই ক্লিনিক 'জন্ম'তে। অনিমেষ যায়। অভিরূপ যায়। প্রতিবার গিয়ে অবাক হয় অনিমেষ। দ্যাখে কত সমস্ত গর্ভবতী জননীরা বসে আছে পরপর। প্রতিজনের শরীর থেকে দুপ দুপ দুপ......প্রাণের শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে দিনের আলোর ভিতরে। তারা এসেছে কেউ রাণাঘাট, কেউ কেউ কৃষ্ণনগর, কেউ হাসনাবাদ, কেউ আসানসোল, ঝাড়গ্রাম থেকে। তাদের সকলেরই এই প্রথম সন্তান। সন্তান কামনায় কামনায় বয়স বেড়ে গেছে অনেক। শেষ অবধি মালোবুড়োর কাছে পৌঁছতে পেরেছে। অনিমেষ অবাক হয়ে জননীদের দ্যাখে। খুব নিস্তব্ধ এই অপেক্ষার ঘর। লম্বা এবং চওড়ায় অনেক। এয়ার কন্ডিশন্ড। আলো খুব উজ্জ্বল নয়। অনেক মানুষ। এক একজনের সঙ্গে এসেছে দু-তিনজন করে। সকলের শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণে অপেক্ষার এই ঘরের শীত কমে এসেছে। মানুষ থাকলে শীত কমে। অনিমেষের মনে পড়ে ম্যাক্সিম গোরকির সেই গল্পের কথা। এক ভবঘুরে পুরুষ আর এক ভবঘুরে নারী, পরস্পরে সংলগ্ন হয়ে তীব্র শীত থেকে বেঁচেছিল। মানুষের শরীর আর মনের উত্তাপ কম কিছু নয়। অনিমেষ পেছন দিকে বসে আছে। মাধবী, অভিরূপ আর সুদীপ্তা তিতলিকে নিয়ে বসেছেন সামনের দিকে। অনিমেষের এখন প্রতিটি দিন যাচ্ছে উদ্বেগে। যে আছে সে যেন আসে নিশ্চিন্তে। তিতলিকে এখন ভাল থাকতে হবে। জীবনদায়ী ইঞ্জেকশন প্রতি সকালে নিতে হচ্ছে তাকে। ইঞ্জেকশনের পর ইঞ্জেকশন। অনিমেষ বাইরে বেরোলে সবসময় চিন্তিত থাকে, এ যেন থাকে। কে জানে মৃত ভ্রূণ বেরিয়ে আসতে যায় কিনা। সাতমাসের পূর্ণগর্ভা, চোখে মুখে মাতৃত্বের বিভা। এই ঘর পূর্ণগর্ভা নারীর শ্বাস প্রশ্বাসে সুরভিত। সকলেই অনুচ্চ কণ্ঠে, ফিসফিস করে কথা বলছে। যেন মাতৃগর্ভে ঘুমিয়ে আছে যারা, তাদের সুখের ঘুম,নিশ্চিন্ত ঘুম না ভাঙে। মাঝে মাঝে শান্তাদির মতো সেই মেয়েটি, জলি আকতার এসে একজনকে নিয়ে যাচ্ছে ভিতরে। পরের জনের নাম অনুচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করে যাচ্ছে। অনিমেষ নিস্তব্ধ অপেক্ষার ঘরে চুপ করে বসে আছে একা। সে তাকিয়ে আছে সমুখে। গভীর নিস্তব্ধতার ভিতরে অনিমেষের কানে যেন ফিসফিসে কচি গলার স্বর শ্লথ আর টলমল পায়ে প্রবেশ করতে থাকে। হাই গ্র্যান্ড পা......এই লোকটা...। কত জোড়া জোড়া

পা। অনিমেষ দেখতে পায় যেন মাতৃগর্ভের ভ্রূণ-শিশুদের। অনিমেষ দেখছে সব ছায়া ছায়া শিশুরা মাতৃগর্ভ থেকে সকলের অলক্ষে বেরিয়ে এসেছে, এই...এই......এই, একজন আর একজনকে ডাকছে। কী কী কী?

......এই এই সে কই?

.........কে কে কে?

.........ধিতাং ধিতাং ধিতাং।

.........ধিতাং কী, ধিতাং কে?

অনিমেষ দেখতে পাচ্ছে শিশুরা খেলছে। খেলছে খেলছে। ছোঁয়াছুঁয়ি খেলছে। ধরতে পারে না খেলছে। লুকোচুরি খেলছে। তারা সবাই হৈ হৈ লাগিয়েছে। কিন্তু একটি শিশু ডাকছে শুধু, ধিতাং ধিতাং, কই কই......।

সে একা এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে এখানে ঘুরছে। সে খেলছে না। সে খুঁজছে। কালা বৈঠা বেয়ে যাও কোন সদাগর......ওরে তুই খেলতে যা, খেলতে যা। অনিমেষের চোখ আর মুখ বুঁজে আসে। এমনি দেখা আর অদেখায় সময় যায়। আর এরই ভিতরে শুধু একটা খবর সংবাদপত্রের কোণে নিঃশব্দে আসে, একটা মিছিল ঢাকা থেকে যাত্রা করেছে সেই মালোপাড়ার দিকে। মালোদের আবার ঘর ফিরিয়ে দিতে। মালোপাড়া পুড়লে ভৈরব , রূপসা, পদ্মা, মেঘনা যমুনা নাও শূন্য হয়ে গিয়েছিল। নাও ছাড়া নদী হয়? মালো ছাড়া নদী হয়? আর নদী ছাড়া দেশ হয়?

# #

তারপর শীত গেল। এল ফাগুন। সেই এক ফাল্গুনে, মরা ডালে যখন কচিপাতা জন্মাল, মা কোলে নিল কচি পাতার মতো তাকে। সবুজ একটি পাতা এল মাতৃবৃক্ষের ডালে। হলুদ হয়ে শুকিয়ে যাওয়া মৃত পাতাটি খসে পড়ল অন্য ডাল থেকে। সমস্ত শীত মৃত আর জীবিতকে বয়ে ক্লান্ত ছিল সে। শুকিয়ে গিয়েছিল। শঙ্কায় ছিল। যদি মৃত ভ্রূণটি বেরিয়ে আসতে চায়? তারা তো একসঙ্গে জন্মেছিল। মৃত মাঝে মাঝে তার ছোঁয়া দেয় যে। যেন নড়ে ওঠে, পাশ ফেরে। তার জন্য তখন সে আকুল হয়। আবার শান্ত হয় যে আছে তাকে নিয়ে। অন্যজন কী ছিল, কে ছিল তা কেউ জানল না। ফাল্গুনের এক সকালে সাফ হয়ে সে ঝরে পড়ল মরা পাতার মতো বৃক্ষতলে। তারপর গেল আর্বজনায়। আর যে এল কচিপাতার মতো, মায়ের কোলে এসেই ডাক দিল, কালা বৈঠা নিয়ে যাও.........।

মা বলল, কাঁদে না সোনা মেয়ে, ও ঝিলমিল ও সোনা, আছে আছে সে আছে, কোথাও না কোথাও আছে রে সোনা।

আছে। মা যে এখনো ছোঁয়া পায় তার। বাতাসে। আলোয়। অন্ধকারে। এই মহাবিশ্বের অনু পরমানুতে। সমস্ত জীবন সে মায়ের কাছে, মাতৃগর্ভে রয়ে যাবে। মাতৃগর্ভেই তার আশ্রয়।